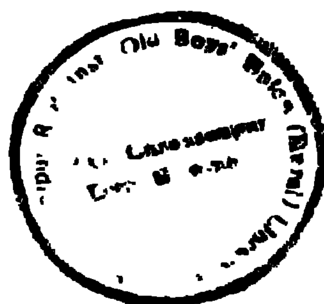
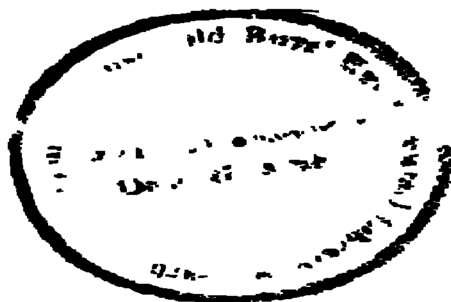




2

পদ্মনাভ



জ্যোতির্ময় রায়



দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড
১৩৫১

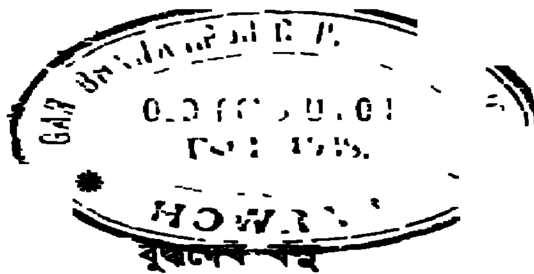
প্রচ্ছদ-শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ ১৩৫১

দাম ঃ ১৸০

মুদ্রণ-স্থান — দি প্রিন্টিং হাউস, ৭০ অপার সারকুলার রোড, কলকাতা
প্রকাশ-স্থান—দি বুক এম্পরিয়ম লিঃ, ২২-১ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলকাতা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ



বুদ্ধদেব বসু

প্রতিভা বসু

করকমলে—

পদ্মনাভ

ফাঁকি

সস্তা

<u>লেডিজ সিট</u>

নেপথ্যে

ভারিক্কি

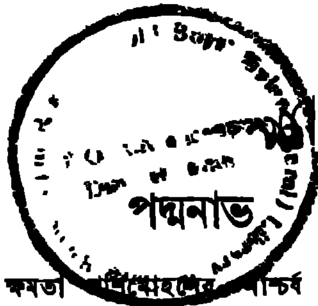
মনিব্যাগ

বৈচিত্র্য

সুরভি

সওদা

কলপ



অবাক হবার ক্ষমতা শশিমোহনের আশ্চর্য রকমের। আকাশে উড়োজাহাজ দেখে যে-আন্দাজ অবাক হয়, বাজারে ঢুকে মাছের দাম দু'পয়সা চড়তি দেখলেও সে-আন্দাজ অবাক হয়। আজ বাড়ির লোকগুলোর কাণ্ড দেখেও সে কম অবাক হয়নি, ছেলে পরীক্ষা দিতে যাবে তা নিয়ে সকাল থেকে এমন হুড়োহুড়ির দরকারটা কি। এত এত টাকা খরচা ক'রে মাস্টার রাখা, বইপত্তর কেনা, সবই তো করা হয়েছে, এখন শুধু দুটো নাকি জবাব লিখে আসা, এ নিয়ে আজ ক'মাস যাবৎ কি চিন্তা আর কি কাণ্ডই না চলেছে। এদিকে মেয়েটা যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না সেটা যেন কিছুই নয়; আজ পর্যন্ত একবার ডাক্তার দেখানো হলো না। বউমা তার ছেলে ছেলে ক'রেই অস্থির—শশিমোহনের মন রীতিমতো বিরূপ হয়ে উঠে সুহাসিনীর উপর।

সুহাসিনী বলেন, 'একটু হাত চালিয়ে নাও শশি, বিমল চান ক'রে এলো ব'লে—তুমি বড়ো ঢিলে।'

অতি পুরোনো চাকর গরুর গাড়ীর চাকার মতো নড়বড়ে চালে চলে কম, শব্দ করে বেশি—শশিমোহনের কাজ যা এগুলো তার চেয়ে বাড়লো বেশি কথার-বিড়বিড়ি। আজ সকাল থেকে মেজাজটা তার বিগড়ে আছে। থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে ব'লে ঢিলেমিটাও একটু বেড়েছে।

সকালে উঠেই শশিমোহন তার নারায়ণের ছবির সামনে মাথা ঠুকে প্রণাম জানায়। আজ প্রণাম সেরে উঠতেই দেখতে পেয়েছে ছবিখানা দুলছে। এমন অবাক কাণ্ড আর কখনো সে দেখেনি। খোলা দরজার কাছে হাত রেখে হাওয়ার জোরটা একবার পরখ করেছে—কিন্তু হাওয়া নয়, হাওয়া হলে সেটা তার গায়েও লাগতো। ছবিখানা সামনে ঝুঁকে, না এপাশ-ওপাশে দুলেছে সে-গবেষণাতেও অনেকটা সময় তার কেটে গেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছবির অনুকরণে মাথা দুলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে সেটা হ্যাঁ কি না।

শেষ পর্যন্ত সম্মতিসূচক ব'লেই যখন সাব্যস্ত হলো তখন শশি-মোহনের খটকা বাজলো নিজের মনের কথাটি নিয়ে। ঠিক সেই সময়টাতে কি তার মনে ছিলো? 'সুমিদিদির কোনো অমঙ্গল হবে না তো?'—সর্বনাশ, এমন কথা নিশ্চয়ই তার মনে ছিলো না। শশিমোহন বড়ই ভয় পেয়ে যায়, সুমিতা ভালো হ'য়ে উঠবে কিনা, এ প্রশ্নটা বার বার গুঁজে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করে। সমস্তটা দিন তার কাটে মনের এই খুঁৎখুঁতি নিয়ে।

সন্ধ্যার পর থেকে সুহাসিনীর হাবভাব দেখেই শশিমোহন বুঝলো অসুখটা সুমিতার বেড়েছে। সে অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়লো সুহাসিনীর মুখের গুমট ভাবটা তার ভালো লাগে না, এমন যার মায়ার শরীর সে এখন ডাক্তার না ডেকে আছে কি ক'রে সেটাও দুর্বোধ্য মনে হয়। কিছুক্ষণ প্যানপ্যান ক'রে কোনোই যখন সুসার হয় না, শশিমোহন ত্যক্ত হ'য়ে চ'লে যায় বিমলের ঘরের দিকে।

বিমলের মাস্টার বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত শশিমোহন আজকাল

বিমলের ঘরে ঢোকে না। পড়ার সময় একদিন আলাপ জমাতে গিয়ে মাস্টারের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিলো, সেই থেকে হুতোম-প্যাঁচার মতো ঐ গম্ভীর মুখটা দেখলেই তার গা জ্বালা করে। আজ ওঁকে গ্রাহ্য করবে না মনস্থ ক'রে ঘরে ঢুকেই সে বলতে লাগলো, 'ছাখো দাদাবাবু, পরীক্ষা তো খুব দিচ্ছ, এখন পড়া রেখে আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শোনো তো বাপু—'

বিমলের মাস্টার মশাই খাতার উপর পেন্সিলটা টিপে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'উজবুকের মতো কথা ব'লো না, এখান থেকে এখন যাও বলছি।'

লোকটির কথা অমান্য করতে বা তার মুখের উপর জবাব দিতে সাহস পেলো না ব'লেই শশিমোহনের অন্তর্দাহটা বেড়ে গেলো। ঝাপটা মেরে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে এলো।—বলে কিনা উজবুকের মতো! গাধার মতো কথা বলার কথা সে শুনেছে, কিন্তু উজবুকটা আবার কেমন জানোয়ার—নিশ্চয়ই গাধার চেয়েও হীন কিছু হবে; ভয় ঝেড়ে রাগটা শশিমোহনের চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো।

একটু থম্ মেরে থেকে নিষ্ফল ক্রোধে জোরে জোরে পা ফেলে সে চ'লে গেলো বাড়ির ভিতর। নারায়ণ এদের মঙ্গল করুন, এদের মেয়ে এরা যেমন খুশি ফেলে রাখুক, তা নিয়ে তার এতটা হেনস্তা হবার দরকারটা কি।

আপন মনে বকতে বকতে শশিমোহন রাতের কাজ শেষ করলো, তারপর আর তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলা না।

নন্টু ছেলেমানুষ, সে অনেকক্ষণ হলো ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো জ্বলছে বিমলের ঘরে। সুহাসিনী সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন,

তারপর এগিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে দেখে এলেন সদর দরজাটা বন্ধ আছে কিনা।

ফিরে এসে যখন বিমলের ঘরে ঢুকলেন, মা'র মুখের দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বিমল প্রশ্ন করলো, 'কি মা—দিদির অসুখ কি খুব বেড়েছে? ডাক্তারকে—'

'একটু বেড়েছে, তা—ডাক্তারের দরকার নেই, দেখি কি হয়।'

এক মাসের উপর হতে চললো মেয়েদের শারীরিক নিয়মের ব্যতিক্রমজনিত অসুস্থতায় সুমিতা ভুগছে, তাই ঘর ছেড়ে সে বড়ো একটা বেরোয় না, এটুকুই বিমল জানে। ডাক্তার ডাকবার কথা পূর্বেও সে দু'একবার বলেছে, কিন্তু মা তেমন গা করেন নি ব'লে চুপ ক'রে গেছে। আজ সন্ধ্যার পর থেকে মা সুমিতাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, এখন তার চোখ-মুখের ভাব দেখে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে বই রেখে বিমল উঠে দাঁড়ালো।

'না মা, কিছু একটা বাড়াবাড়ি হবার আগেই ডাক্তার দেখানো ভালো।'

'ভয়ের কোনো কারণ থাকলে আমি বুঝতাম—তোকেও বলতাম। এখন যা তো বাবা শুয়ে পড় গে, পরীক্ষা চলছে, রাত জেগে তোর আবার কিছু একটা না হ'য়ে পড়ে।'

'বারোটা অবধি তো রোজই পড়ি, মা।'

'না বিমল, অসুখ-বিসুখ দেখে মন আমার ভারি খারাপ হয়ে গেছে —তুই শুতে যা। একরকম জোর ক'রেই বিমলকে শুইয়ে দিয়ে সুহাসিনী ঘরের লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিলেন।

ঘণ্টাখানেক পর সুহাসিনী বেরিয়ে এলেন সুমিতার ঘর থেকে। বাইরের ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন—ভয়ে তাঁর হাত পা ভারি হয়ে এসেছে। স্বামীর কথা সুহাসিনীর মনে পড়ে, তিনি জীবিত থাকলে এতটা ভয় ভাবনার ভিতরও এমন নিঃসহায় বোধ তিনি করতেন না। সুমিতার বিয়ে দিয়েই তিনি চিরদিনের জন্য ছুটি নিলেন। কিন্তু তাঁর দেওয়া কোনো কর্তব্যই তো সুহাসিনী অবহেলা করেন নি, তা ছাড়া জীবনে এমন কোনো অন্যায় করেছেন ব'লেও তাঁর মনে পড়ে না যার প্রতিফলে এতবড়ো অভিশাপ তাঁর প্রাপ্য হতে পারে।

ছোট মেয়ে অমিতার বিয়ে দিয়েছেন সুহাসিনী নিজে। দিন দুই হলো জামাই লিখেছে, অমিতা অন্তঃসত্বা। এই প্রথমবার, অমিতা নাকি অস্থির হয়ে উঠেছে মা'র কাছে আসবার জন্যে—শিগ্‌গিরই তাকে পাঠাবে। এই মেয়ে জামাই, আত্মীয়-স্বজন, মান-সম্ভ্রম সবই বুঝিবা ছাড়তে হবে—সুহাসিনী ন'ড়ে চ'ড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন, না, ভয় পেলে তাঁর চলবে না।

ঘরে ঢুকে আঁচ ক'রে দেখলেন বিমল ঘুমিয়েছে কিনা। ব্যাপারটা বিমলের চোখের আড়ালে রাখতে সুহাসিনীকে কম বেগ পেতে হয় নি। এসব বিষয়ে বিমলের দৃষ্টিটা একটু ভোঁতা, তার উপর দু'তিন মাস যাবৎ সে তার পড়াশুনা নিয়েই অতিমাত্রায় ব্যস্ত—তাই বুঝিবা এতটা সম্ভব হয়েছে।

বিমল ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাগ্যি তখন তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু একা সবদিক তিনি সামলাবেন কি ক'রে। সাহস সঞ্চয়ের সব চেষ্টাকে তাঁর ব্যর্থ ক'রে হাত পা যেন ভয়ে গুটিয়ে আসতে

চাচ্ছিলো। একজন কাউকে তাঁর দরকার যার উপর নির্ভর করা যায়, যাকে বিশ্বাস করা যায়।

অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে সুহাসিনী আঙিনায় নেবে এলেন। পশ্চিমের ভিটেয় একখানা একতলা, তাতে দুটোই মোটে ঘর; তারই একটার জানালার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো দেখা যাচ্ছিলো। একটু ঠেলে দিতেই জানালা খুলে গেলো। ভিতরে দেয়ালের নীচের দিকে পেরেকে লটকানো একখানা নারায়ণের ছবি, যাঁর নাভি-পদ্মে ব'সে আছেন চার মাথাওয়ালা ব্রহ্মা, তারই সামনে চোখ বুজে ব'সে আছে মস্তিষ্কহীন শশিমোহন।

শশিমোহন চোখ বুজে থাকে ইহলোক ভুলবার জন্যে নয়, ইহলোকের আবেদনকে একাগ্র করতে। নিজের হয়ে চাইবার তার কিছু নেই, সব আবেদন নিবেদন তার সুমিতারই জন্যে—সুমিতাকে সে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। সুমিতার এবারকার অসুস্থতা নিয়ে তার মনে বড়ই অশান্তি, সামনে থেকে দেখাশুনা না করতে পারাটাই হয়েছে তার সব চাইতে বড়ো অসোয়াস্তির কারণ। সুমিতার অসুখটা আজ বেড়েছে কিন্তু প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থাই হয়নি সে জানে, তাই নিরুপায় হয়ে চোখ বুজে বসেছে তার দেবতার কাছে।

এ পরিবারে প্রথম প্রবেশ করে শশিমোহন ছোকরা-চাকর হিসেবে। যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমা রেখায় আজ এসে পৌঁছেছে কিন্তু আপনার বলতে এ পরিবারের বাইরে কেউ তার নেই, হবে ব'লেও আশা রাখে না। শান্ত, সরল, ভালো মানুষ এই শশিমোহন—নির্ভর করতে যদিও বা চোখ মেলতে হয়, বিশ্বাস রাখা

যায় তার উপর চোখ বুজে। বিশেষ ক'রে সুমিতার ভালোর জন্যে সে যে সব কিছুই করতে রাজি এ-কথা সকলেই জানে।

সুহাসিনী জানলায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'শশি—'

শশিমোহন চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। 'কে—বউমা।' ত্রস্ত উঠে এসে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলো, 'কি বউমা, কি হয়েছে?'

সুহাসিনী আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তার মুখ দেখে শশিমোহন থমকে গেলো। অমন শান্ত সুন্দর মুখখানা যেন জ'মে শক্ত হ'য়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে ক্যাকাশে গলায় সে জিজ্ঞেস করলো 'কি বউমা, আমার সুমিদিদির কিছু হয়নি তো?'

'ভারি বিপদ আমাদের শশি—'

বিপদ শশিমোহন সেটা বুঝেছে—কি বিপদ জানবার জন্যে ভীত ব্যাকুল চোখে সে তাকিয়ে থাকে।

শুকনো গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে সুহাসিনী বললেন, 'সুমি-র সন্তান হবে শশি।'

সন্তান হবে! এ তো আনন্দের কথা। অনেক কালের সাধ শশীর সার্থক হতে চলেছে, খুশির হাসিতে তার মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এমন ক্ষেত্রে সচরাচর যা ব'লে ভরসা দেওয়া হয় তাই তার মনে পড়ে, 'ভালোয় ভালোয় দু'ভাগ হ'য়ে যাবে বউমা কিছু ভেবো না'—ছবিখানার দিকে একবার তাকায়, 'মাথার ওপর নারায়ণ আছেন,' উবু হ'য়ে জোড়হস্তে প্রণাম জানায়।

সুহাসিনীর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে আসে। স্নেহপ্রবণ সাদাসিধে লোকটিকে বোকা বলতে তাঁর বাধলো, বললেন, 'বুড়ো হতে চললে শশি তবু সামান্য হুঁসটুকু তোমার হলো না। আজ তিন বছর হ'তে

চললো জামাই-এর সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেছে সেটা কি ভুলে গেছ—এ যে ভয়ানক কলঙ্কের কথা।'

শশিমোহনের মাথায় যেন ঝাঁকুনি লাগে। তাই তো, ভগবানের কাছে চাইবার সময় অত হিসেব তো সে করে নি। সুমিতার মঙ্গল কামনা করতে গিয়ে কি সে চাইতে পারে তার হদিস পেতো না। যার স্বামী বোম্বাই না কোন শহরে বে-থা ক'রে সংসার পেতে বসেছে তাকে ভগবানই বা কোন পথ দিয়ে সুখ শান্তি দেবেন। এমন অবস্থায় শুধু একটি খোকা বা খুকি থাকলে তার ও তার সুমিদিদির দিন বেশ কেটে যেতো, এ কথাই সে চোখ বুজে ভেবে এসেছে। তা ছাড়া এ তার আজকের আকাঙ্ক্ষা নয়, সেই সুমিতা যখন তার কোলে চেপে বেড়াতো তখন থেকেই সুমিতার ছেলেকে কোলে নেবার বাসনা তার মনে বাসা বেঁধেছে। এতদিনকার অতৃপ্ত বাসনাটা তাই আকস্মিক মুহূর্তে আগুপেছু না ভেবেই বুঝিবা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলো।

শশিমোহন তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়। ধীরে ধীরে বিষয়টা তার কাছে সহজ হয়ে আসতে থাকে। কিছুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে। লম্বা-চওড়া সুন্দর মতো চেহারার এক ভদ্রলোক আসতো এ বাড়িতে, যার নামটা সে সঠিক উচ্চারণ করতে পারতো না ব'লে সবাই কত না হাসাহাসি করতো—সেই লোকটির সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা করার অপরাধে সুমিতাকে অনেকবার সে বকুনি খেতে শুনেছে বউমা'র কাছে। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে এ-বাড়িতে আসতে বারণ ক'রে দেওয়া হয়েছিলো, এও সে জানে।

ঘটনার গুরুত্ব খানিকটা উপলব্ধিতে আসতেই সম্ভব-অসম্ভব বিবেচনা না ক'রে শশিমোহন ব'লে বসলো, 'সুমিদিদিকে কোথাও পাঠিয়ে দেও বউমা, আমি ওদের প্রাণ দিয়ে দেখাশোনা করবো।'

'তুমি বড়ো কম বোঝ শশি, তা সম্ভব নয়।'

'তবে সন্তানটাকে দাও, নিয়ে চ'লে যাই একদিকে।'

'ওটাকে বাঁচাবার কোনো মানে হয় না শশি—সারা জীবন দশজনের কাছে ঘেন্নার আর অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।'

'তবে—তবে কি করবে বউমা, মেরে ফেলবে?' ভীত অসংযত কণ্ঠে শশিমোহন ব'লে ওঠে।

'চুপ, আস্তে—' সুহাসিনী চাপা গলায় বলতে থাকেন, 'এ ভয়ানক অপরাধ—এর ভয়ানক শাস্তি· কিন্তু উপায় নেই,' সুহাসিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, 'জীবনে এ-কথা মুখে এনো না শশি।'

মূঢ় শশিমোহন অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এসব কেমন কথা! এর জন্ম অপরাধ, জীবন অপরাধ, জীবন নষ্ট করা অপরাধ—কী তবে করতে হবে। বড়ই জটিল মনে হয় শশিমোহনের কাছে, হতাশ হয়ে বলে, 'যা হয় তুমি করো বউমা, আমি মূর্খ মানুষ আমি কি আর বলবো।'

শশিমোহনকে নিয়ে সুমিতার ঘরে ঢুকে সুহাসিনী দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। বিপদের মুখে আবার লজ্জা-শরম কিসের। একজন কাউকে তিনি প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চান—অনভ্যস্ত এ অন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গতা তাঁর দুঃসহ মনে হয়।

সুমিতা শুয়ে আছে একটা তক্তপোশের উপর। মাথার আশে-পাশে ছড়ানো একরাশ চুল, এলোমেলো সেই কালো চুলের

মাঝখানে তার শুভ্র সুন্দর মুখ এলিয়ে পড়েছে। ক্লান্ত চোখ মেলে সে একবার তাকালো। শশিমোহনের স্তিমিত চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন তার মনে অনেকখানি ভরসা এনে দেয়—ও চোখে ত্যক্ততা নেই, তিরস্কার নেই। তার বেঁচে থাকবার সবটুকু যুক্তি, সবটুকু শক্তি সে বুঝি খুঁজে পায় ঐ দুটি চোখের ভিতর। অশিক্ষিত এই বোকা লোকটিকেই আজ তার সব চাইতে আপনার মনে হয়।

সুমিতার ব্যথাটা আবার তার উরু বেয়ে কোমর অবধি উঠে অসহ্য তীব্রতায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কলঙ্কের ভয়ে নয়, সহ্য করবার ক্ষমতাটাই সুমিতার অপরিসীম। বেদনা-সূচক ক্ষীণ শব্দটুকুও তার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয় না। উদ্‌গত আর্তনাদ রোধ করতে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে যায়, মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো আপ্রাণ শক্তিতে শক্ত হয়ে আসে। শুধু মাঝে মাঝে সজোরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস।

সুহাসিনী সুমিতার দেহকে প্রয়োজনীয় ভঙ্গিতে শুইয়ে দিলেন। সুমিতার সঙ্কোচের অন্ত থাকে না। কিন্তু স্নেহান্ধ এই প্রৌঢ় লোকটির অনুপস্থিতি সে বুঝি ভাবতে পারে না,—তাই নিঃশব্দে চোখ বুজে মাথাটাকে অন্য পাশে এলিয়ে দেয়।

শশিমোহনের কৃষ্ণবর্ণ দীঘল দেহ দেয়ালের গা ঘেঁষে নিশ্চল হয়ে রইলো। অনাবৃত সুকুমার দেহ, মাতৃজঙ্ঘার বিস্তৃত তোরণ তার চোখে ফুটিয়ে তুললো অগাধ বিস্ময়—গত ও ভবিষ্যৎ তার মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেলো। পশুর জন্ম সে দেখেছে কিন্তু মানুষের আবির্ভাব কখনো দেখে নি, মন তার উৎকণ্ঠিত সশ্রদ্ধ-আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে মানুষের শিশু মানুষের জঠর থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের হাতে আশ্রয় নিলো, আর মুহূর্তে সে-হাত শিথান থেকে স'রে এসে রুদ্ধ করে দাঁড়ালো তার শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ দুটোকে। সদ্যজাত দুর্বল স্নায়ুর ক্ষণিক কুঞ্চন ও প্রসারণের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেলো ক্ষুদ্র জীবণের ক্ষীণ প্রতিবাদ।

শশিমোহনের অন্তরটা আর্তনাদ ক'রে উঠলো, কিন্তু ভয়ে তার মুখ দিয়ে সামান্য শব্দটুকুও বেরুলো না।

সুহাসিনী সন্তানটাকে তেমনি ধ'রে থেকে বললেন, 'শশি শিগগির এসো, সুমি'র নাভির উপরটায় খুব জোরে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরো।'

কেন, তার সুমিদিদিকেও মেরে ফেলতে চায় নাকি! 'না বউমা এ আমি পারবো না, এ আমি হতে দেবো না।' দৃঢ় স্বরে শশিমোহন প্রতিবাদ জানালো।

'আঃ—' চাপা গলায় সুহাসিনী ধমকে উঠলেন। শশিমোহনের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, 'ওর ভালোর জন্যেই ওরকম করা দরকার। বলছি যা শোন, খুব জোর দিয়ে চেপে ধরো।'

এবার শশিমোহন সুহাসিনীর কথায় বিশ্বাস ক'রে এগিয়ে গেলো।

খুবই সহজে ও স্বল্প সময়ে গর্ভকুসুম খ'সে পড়লো। সুহাসিনীর যে-হাতের তলায় মুহূর্ত আগে একটা জীবন নষ্ট হ'য়ে গেছে, সে-হাতেই সুমিতার জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে সন্তর্পণে ফুলটাকে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো সবটা বেরিয়েছে কিনা।

সুহাসিনীর নির্দেশ মতো হাতের চাপ ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই শশিমোহনের যা নজরে পড়লো তাতে সে ভয়ে ও বিস্ময়ে আঁৎকে উঠলো। এবার আর নিজেকে সে দমন করতে পারলো না, ব'লে

উঠলো, 'আঃ হা—কি সর্বনাশ করেছো বউমা, এ যে স্বয়ং নারায়ণ, দেখছো না নাভিপদ্ম রয়েছে যে!'

'আঃ, চুপ করো শশি, তুমি বড়ো বোকা—এরকমই হয়।'

এরকমই হয়, বউমা বলে কি। নাভির বোঁটায় ওরকম পদ্ম নারায়ণ ছাড়া আর কারুর হতে পারে নাকি, হয় বললেই শশিমোহন বিশ্বাস করবে কেন? ভয়ে চোখ বুজে সে ব'সে পড়ে, মনে মনে কেবলই বলতে থাকে, সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে।

সুহাসিনী ডাকলেন, 'শশি—'

শশিমোহন চোখ মেলে উঠে দাঁড়ালো, তারপর যন্ত্রচালিতের মতো সে সুহাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে আঙিনায় নেবে এলো।

শশিমোহনের দিন এক রকম কেটে যায় কিন্তু মন থেকে ভয় তার কিছুতেই কাটতে চায় না। তার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়ে গেছে এ-পরিবারে একটা সর্বনাশ অনিবার্য।

সুহাসিনীর মনও আশঙ্কায় ভীত হয়ে আছে, তবে কিনা নিজেকে প্রবোধ দেবার মতো যুক্তি তিনি খুঁজে পান। ক্ষুদ্র নাক ও মুখের উপর যারা তাঁর হাতটা চেপে ধরেছিলো তিনি তার একটা অংশ মাত্র, এ-কথা যখন ভাবতে পারেন, অসংখ্যের দায় ক্ষুদ্রাংশ হয়ে মনটাকে তাঁর একটু হালকা ক'রে আনে।

কিছুদিন হ'লো অমিতা এখানে এসেছে।

কোনো শুভ কাজে হাত দেবার মতো সাহস আর সুহাসিনীর নাই। তাঁর ইচ্ছা ছিলো না অমিতা এবার এখানে আসে। কিন্তু এই তার প্রথম বার, কি অজুহাতে আসতে তাকে বারণ করা যায় ভাবতে ভাবতেই সে একদিন এসে উপস্থিত হলো।

অমিতার সাধভক্ষণের দিন অতিথি অভ্যাগততে বাড়ি ভ'রে ওঠে। সুহাসিনীর দেওয়া 'সাধে'র শাড়ি প'রে অমিতা ঘুড়ে বেড়ায়, ছিপছিপে লম্বা মানুষটিকে একটু যেন খাটো দেখায়।

অমিতাকে দেখলেই শশিমোহনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। নতুন শাড়ির শক্ত ভাঁজের উপর দিয়ে আসন্ন মাতৃত্বের আভাস যদিও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় না, তবু শশিমোহনের চোখ সেখানটায় থেমে থাকে। ঐ তো ওখানটায় তেমনি ছোট্ট একটি মানুষ লুকিয়ে আছে, একদিন অমনি ক'রেই বেরিয়ে আসবে—ভয়াবহ সেই রাত্রের রূপ, রক্ত ও জীবনের ছবি শশিমোহনের চোখের সামনে ভেসে উঠে, মনে মনে বলতে থাকে, ভগবান যা শাস্তি দেবার আমাকে দাও, ওদের কোনো অমঙ্গল তুমি কোরো না।

পদ্মের কথাটা মনে পড়ে। এরও নাভিতে ওরকম পদ্ম আছে কিনা জানবার জন্য শশিমোহন কৌতূহল হয়। এ প্রশ্নটা আজও সে মুখ ফুটে কারুর কাছে করতে পারে নি, কেমন একটা অহেতুক ভয়ে ও দ্বিধায় জিব তার আটকে গেছে।

অমিতার ব্যথা উঠলো একদিন দুপুর বেলায়। ব্যথাটা এক-একবার উঠে কেবলই প'ড়ে যেতে লাগলো। সন্ধ্যার দিকে ব্যাপারটা রীতিমতো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

সুহাসিনী শশিমোহনের চোখের দিকে তাকাতে পারেন না,

শশিমোহনও তাকে দেখলেই স'রে যায়। একটা কিছু অমঙ্গল ঘটবে এ তো তারা জানতোই।

আত্মীয়স্বজন ও পাড়ার প্রবীণ-প্রবীণায় বাড়ি ভ'রে গেলো। অবশেষে এলো ডাক্তার, সঙ্গে তার যন্ত্রপাতি।

শশিমোহন প্রয়োজনের তাগিদে ছুটোছুটি করে, আর মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করে। গরম জল এগিয়ে দিতে গিয়ে একটা যন্ত্রের চেহারা দেখে সে আঁৎকে উঠলো, ওটা দিয়ে কি করতে পারে ভাবতে গিয়ে ভয়ে মাথা তার ঝিমঝিম করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর জানা গেলো সন্তানটা বের করা হয়েছে কিন্তু সেটা বোধ হয় মৃত।

শশিমোহনের আন্তরিক প্রার্থনা বন্ধ হয়ে গেলো। অমিতার হয়েও আর কোনো আবেদন জানাতে সে ভরসা পেলো না। কা'কে শাস্তি দিতে হবে না-হবে তা নিয়ে তার মতো অপরাধীর উপদেশ ভগবান শুনবেন কেন! এ পাপের শাস্তি সে পাবে, সুহাসিনী পাবে, এ-পরিবারের সবাইকে পেতে হবে।

এত বড়ো দুর্ঘটনার মধ্যেও সেই কৌতূহলটা তার জেগে উঠে। ধীরে ধীরে আঁতুড় ঘরের দিকে শশিমোহন এগিয়ে গেলো। ঘন ঘন ঘরবার করার দরুণ দরজা অনেকটা ফাঁক হয়েই ছিলো, শশিমোহন দেখতে পেলো সুহাসিনী সেই রকম একটা রক্ত-পদ্মের উপর তেমনি ক'রেই ঝুঁকে আছে, আর ডাক্তারবাবু মৃতশিশুর মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে পায়ে ধ'রে ঝাঁকছে। দাই বেটি হাত নেড়ে বলছে, 'আহা, অমন ক'রে ঝোঁকো নি বাবু, আদা চিবিয়ে নাকমুখে ফুঁ লাগালেই হবে—'

আর হয়েছে, যেটুকু প্রাণ ছিলো ঐ ঝাঁকুনিতেই ধড় ছেড়ে পালিয়েছে। এ তো আর মানুষে ঝাঁকছে না, ঝাঁকছে দৈবে।—শশিমোহন দরজার সামনে থেকে সরে এলো।—কিন্তু বউমা তাব ঠিকই বলেছিলো, ওরকমই হয়। আঁতুড়ঘরে মানুষ তবে তার ঐ দেবতার মতো হয়েই দেখা দেয়। সেই দেবতার অভিশাপ লেগেছে—অকস্মাৎ শ্বাস টানতে শশিমোহনের কেমন কষ্ট হতে থাকে, কেউ যেন তার নাকেমুখে ঝাপটে ধরেছে—

হঠাৎ মরা সন্তানটার কান্নায় শশিমোহনের অবশ চেতনা গা ঝাড়া দিয়ে চমকে উঠলো, এমন অবাক কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

মেয়েরা শাঁখ বাজালো, ঝাঁকে ঝাঁকে উলুধ্বনি করলো—মানুষ মানুষের সন্তানকে অভিনন্দন জানালো।

স্যুট-পরা ডাক্তার খট্‌খট্‌ শব্দে বেরিয়ে গেলো, শশিমোহন বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো। লেখাপড়া-জানা লোকগুলোর উপর মন তার অসীম শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠলো। যারা মরা সন্তান পেট থেকে টেনে বা'র ক'রে বাঁচিয়ে তুলতে পারে, ভগবানের অভিশাপকে যারা হার মানাতে পারে—তারা সব পারে—

কিন্তু এত যারা পারে তারা তার সুমিদিদির সুখ-শান্তির—তার বাঁচা-ছেলেটাকে কোলে তুলে নেবার একটা পথ ক'রে দিতে পারে না কেন!

মূর্খ শশিমোহন এর কোনো কারণ খুঁজে পায় না।

ফাঁকি

যাদের চলেনা কিছুই কিন্তু চালাতে হয় অনেক-কিছু, শুভেন্দু তাদেরই একজন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাড়িওলার মুখ থেকে শুনতে হয়েছে, 'আপনার চলছে সবই, যত গোলমাল আমার ভাড়ার বেলায়।' মুদি বলে 'সবই চলছে, চলে না শুধু আমার পাওনাটা।' দুধওলা, কয়লাওলার মুখেও ঐ একই কথা শুনতে হয় শুভেন্দুর—সবই যখন চলছে তখন তাদের পাওনা নিয়ে টালবাহানা করলে তারা মানবে কেন!

সব চলছে ব'লেই যেন তারা টাকা চাইতে আসে, নইলে বুঝি তাকে রেহাই দিত! শুভেন্দু চুপ ক'রে শোনে। বলে না কিছুই—কি-ই বা তার বলবার আছে।

খামোকা বিছানার তোষকটা একবার উল্টে পাল্টে দেখে, জানে তলায় কিছু নেই—তবু। পুরোনো অভ্যাসের জের টানা। এক সময় পকেটের খুচরো পয়সাগুলো ছুড়ে দিতো বিছানার তলায়, নেহাৎ কখনো-সখনো দরকার পড়লে ওতে হাত পড়তো।

সুধার টাকাটায় দু'দিন কোনোরকমে চলেছে। টাকা দেবার সময় সুধা সেদিন বলেছিলো আর নাকি একটা তামার পয়সাও রইলো না তার কাছে। ঠেকা-বেঠেকার জন্যে সামান্য-কিছুও কি হাতে রাখে নি। অমন আরও তো ক'দিন বলেছে, এই শেষ—আর কিছু নেই তার হাতে।

কিন্তু সেদিনকার বলার ধরনটা ছিলো যেন একটু অন্য রকম, অবিশ্বাস হ'তে চায় না। তবু সুধাকে সে ডাকে একবার জিজ্ঞেস করবার জন্যে।

সুধা এক কোণে গোঁজ হ'য়ে ব'সে ছিলো। ভেজা চোখে এসে শুভেন্দুর সামনে দাঁড়ালো। খানকয়েক ঘুঁটের অভাবে বেচারা উনুনে আগুন দিতে পারে নি।

'ঘুঁটের ধোঁয়ায় মানুষের চোখে জল আসে জানতাম, তোমার দেখছি উল্‌টো'—শুভেন্দু ফ্যাকাসে গলায় এরই মধ্যে একটু কৌতুক করে। 'উনুনে আগুন দিলেই তো আর পেটের আগুন নিভবে না—তবিলে সামান্য-কিছু কি আছে?' শুভেন্দু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো সুধার মুখের দিকে।

জবাবে সুধা নীচের ঠোঁটটা উল্‌টে দিয়ে মুখ ফেরালো। হঠাৎ রাগ বস্তুটা শুভেন্দুর শিরা-উপশিরায় ছুটোছুটি শুরু ক'রে দেয়। ওরকম ক'রে ঠোঁট উল্‌টে জবাব দেবার মতো কথা এটা নয়। নেই, কোথায় সেটা ভালো ক'রে বলবে, কি করা যায় তা নিয়ে ভাবিত হ'য়ে উঠবে, তা না এসেছে দায় সারা জবাব দিতে।

তবিলের শূন্যতা নয়, উত্তর দেবার ভঙ্গিটাই যেন সে সইতে পারে না। তিক্ত মুখে ধম্‌কে ওঠে, 'সরো বলছি সাম্‌নে থেকে! কোনো-রকম উপকারে তো আসবেই না, অসময়ে বুদ্ধি ক'রে একটা কথা বলতে পর্যন্ত শেখোনি—অশিক্ষিত জানোয়ার।'

শুভেন্দু উঠে ঘরের ভিতর পাইচারি করতে থাকে। ইচ্ছা হয় গলা ছেড়ে খুব খানিকটা গালাগাল করতে, ইচ্ছে হয় ঘরের জিনিষপত্র ভেঙে তচনচ করতে; আবার এ কথাটাও শুভেন্দুর মনে উঁকি দেয়

বৈকি, কি এমন কারণ ঘটলো যার জন্যে সে এতটা রেগে যেতে পারে।

উপস্থিত কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘটনাই যে এর কারণ নয় সেটুকু বুঝবার মতো বিবেচনাশক্তি শুভেন্দুর আছে। এই রাগ, এতটা ত্যক্ততার পিছনে যে কারণ, তার জন্যে দায়ী করতে পারে এমন একটি লোকও আজ তার আওতার মধ্যে নেই।

একদিন ছিলো যখন মাঝে মাঝে রেগে উঠতে শুভেন্দুর বেশ লাগতো। একটু রাগ করলে মন্দ হয় না, ভেবে নিয়ে হয়তো সে চ'টে উঠতো। বাড়ির সবার মুখে ফুটে উঠতো একটি ভাব, খোকা রাগে না, রাগলে বড়ো ভয়ানক—বেশ উপভোগ করতো সে সবার মুখের ঐ শঙ্কিত ভাবটা। আজ সামনে আছে একমাত্র সুধা। রাগ করার উৎসাহটাও তার কাছ থেকে পায় না ব'লে ভিতরে ভিতরে সে আরও রেগে যায়। রাগে, দুঃখে ঐ একই রকম ভিজে-ভিজে চেহারা নিয়ে সুধার গুম্ হ'য়ে ব'সে থাকাটা সে যেন বরদাস্ত করতে পারে না।

ঘরের কোণে ছিলো একটা বেতের চেয়ার, বসতে গেলে যেটা চার পা ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। পাইচারি থামিয়ে শুভেন্দু সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো; হঠাৎ হাতে তুলে নিয়ে দুমড়ে মুচ্‌ড়ে শুরু করলো ভাঙতে।

সুধা ভয় পেয়ে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায় শুভেন্দুর দিকে। শুভেন্দু ক্ষেপে গেলো নাকি, শেষপর্যন্ত মারধর করবে না তো! তা-ও কি সম্ভব শুভেন্দু তো তেমন লোক নয়—তবু ভয়ে সুধার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

শুভেন্দু চেয়ারটাকে টুকরো-টুকরো করলো, তারপর টুকরোগুলি পা দিয়ে ঠেলে দিলো সুধার সাম্‌নে। 'যাও, উনুনটা ধরিয়ে মেয়েটার দুধটা অন্তত চাপিয়ে দাওগে, যাও। বুদ্ধি খরচা ক'রে যে একটা ব্যবস্থা করবে তা নয়, পারো শুধু চোখের জল ফেলতে।'

বুদ্ধির দৌলতে ঘুঁটের পরিবর্তে একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে শুভেন্দু বেরিয়ে পড়লো।

বেকারত্বের চরম অবস্থায় পদার্পণ করেছে এই প্রথম, তাই ভয় ও ত্যক্ততাটা শুভেন্দুর বড়ো বেশি তীব্র।

সারা সকাল ঘুরেও একটা টাকা শুভেন্দু যোগাড় করতে পারলো না। মাথার উপর রোদটা হ'য়ে উঠেছে প্রখর, আশায় ঘুরে বেড়াবার মতো ইচ্ছা ও উদ্যম দুটোতেই তার ঢিলে পড়েছে। আপিসের সময় পেরিয়ে গেছে, বন্ধুবান্ধবও কেউ বড়ো একটা বাড়ি নেই, কা'র কাছেই বা আর যাবে! আস্তে-আস্তে সে বাড়ি ফিরে এলো—এক্ গেলাস জল খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার না হয় চেষ্টা ক'রে দেখবে।

বাড়ি ঢুকে শুভেন্দু দেখতে পেলো রান্নাঘরের দোর খোলা, সুধা তার পাশের-বাড়ির বন্ধুটির সঙ্গে ব'সে গল্প করছে। একপাশে প'ড়ে আছে বঁটি আর তরকারির ঝুড়ি, ভাতের ডেকচিটা উনুনে চড়ানো, কিছুটা দূরে একটা থালায় আর দুটো বাটিতে কি-সব ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

খুবই একটা নিশ্চিন্ততা ও রাগ নিয়ে শুভেন্দু গিয়ে ঘরে ঢুকলো।

নিশ্চয়ই সুধার কাছে পয়সা ছিলো, তার দেরি দেখে বন্ধুর বাড়ির চাকরকে দিয়ে কিনেকেটে এনেছে। তার ক্ষমতা সুধা পরখ ক'রে

দেখতে চায় নাকি! নইলে তার কাছে পয়সা থাকতে শুভেন্দুকে রোদ মাথায় ক'রে দশজনের কাছে অপদস্থ হ'য়ে বেড়াতে হয় কেন! অবিশ্যি আজ বাদে কাল এমনি ক'রে বেরুতে তাকে হবেই; নিষ্ফলতা অপমান, শারীরিক কষ্ট এসবও মেনে তাকে নিতেই হবে, শুভেন্দু তা জানে, কিন্তু সুধার এ মনোবৃত্তিকে কিছুতেই সে ক্ষমার চোখে দেখতে পারে না।

হয়তো এও হ'তে পারে সুধার কাছে কিছুই ছিলো না, ধার নিয়েছে তার এই বন্ধুটির কাছ থেকে। এ চেষ্টাও তো সে আগেই করতে পারতো। চেষ্টা না করুক, তার সাধ্যের ভিতর এ একটা পথ রয়েছে একটু জানিয়ে দু'টো কথা বললেও তো দুঃসময়ে মনে শুভেন্দু একটু বল পায়। সুধা হয়তো ভেবেছে খুব একটা বাহবা লুটবে তার কাছ থেকে, আসুক সে, এই মুরুব্বিয়ানার জবাবটা এবার ভালো হাতেই পাবে।

সুধার সংগৃহীত অন্ন সে স্পর্শ করবে না, এটা শুভেন্দু মনে-মনে স্থির ক'রে ফেললো। সে না খেলে সুধাও খাবে না—তা না খাক; এ নিয়ে একটা বোঝাপড়ার পর সুধা চ'লে যাক তার ভাইয়ের কাছে, তার কোনো আপত্তি নেই—ভালো ক'রে একবার বুঝে আসুক কষ্টই বড়ো, না মানটা বড়ো।

মাথার ভিতর একদঙ্গল চিন্তা নিয়ে শুভেন্দু ঘরের মধ্যে পাইচারি করছিলো এমন সময় সুধা এসে ঘরে ঢুকলো।

শুভেন্দু থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বন্ধু চ'লে গেছে?'

'হ্যাঁ—'

'বস্, আর কিছু শুনতে চাইনে।' চাপা কণ্ঠ যথাসম্ভব কটু ক'রে

শুভেন্দু বলতে লাগলো, 'এখন বলবে তো আজকের মতো ব্যবস্থা করেছি—যাও, চান করতে যাও। কিন্তু তার আগে—'

আশ্চর্য হ'য়ে সুধা ব'লে উঠলো, 'ব্যবস্থা হ'লে তো ও-কথা বলবো, আমি আরো তোমার অপেক্ষায়—' কথা সুধা শেষ করলো না। তার ঠোঁটের কোণে দেখা দিলো একটু করুণ হাসি। 'যাক, বন্ধুকে ঠিকই ঠকাতে পেরেছি, তুমিও যখন ধরতে পারো নি—'

'তার মানে?'

'মানে আর কি—ঢুকবার সময় রান্নাঘরটা চোখে পড়ছে, না?—যখন-তখন ও আসে গল্প করতে, তাই দু'একটা থালা-বাটি চাপা দিয়ে ফেলে রেখেছি, ভাতের ডেক্‌চিটায় জল ঢেলে বসিয়ে দিয়েছি উনুনে, খালি-খালি জলবে—এতো বেলা হ'য়ে গেছে, ভারি লজ্জা করে—'

দেখতে-দেখতে দু'চোখ সুধার জলে ভ'রে আসে, এলিয়ে-পড়া সেই ম্লান হাসিটুকু তখনও তার ঠোঁটের কোণে।

আর শুভেন্দু—এত বড়ো একটা কৌতুকের কথা শুনে তারও বুঝি বা হেসে উঠতেই ইচ্ছে করে।

সস্তা

কলকাতায় পাশাপাশি বাড়িতে থাকাটা পরিচয়ের সূত্র কখনো হয় না—সুধীরঞ্জনবাবুকে দেখি, তার সুউচ্চ কণ্ঠ শুনি কিন্তু মৌখিক পরিচয় হবার মতো কোনো কারণ ঘটে নি।

সেদিন সরাসরি আমার বসবার ঘরে এসে যখন ঢুকলেন, একটু শঙ্কিত হলাম। পাশের বাড়ির মালিকের অনাহূত আগমনের পিছনে প্রায়ই থাকে পড়শীর কোনো ত্রুটিজনিত উত্তেজনা।

আমাকে ভদ্রতা করার সুযোগ না দিয়েই সুধীরঞ্জনবাবু আসন গ্রহণ করে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। কারণটা অবাঞ্ছনীয় কিছু নয়। তিনি তার ভাড়াটে-মুখাপেক্ষী গ্যারেজ-ঘরটায় একটি মুদির-দোকান খুলছেন, পাড়াপড়শীদের সহানুভূতি চান। দোকান 'প্রতিষ্ঠা' হবে কাল, সে-উপলক্ষ্যে দস্তুরমতো ছাপানো একখানি চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করলেন। হঠাৎ মুদির-দোকান কেন খুলছেন তার কারণও জানালেন। মেয়ের বিয়ের সওদা করবার সময় পাইকারি দরে জিনিষ কিনে তিনি আবিষ্কার করেছেন, নিত্য-দরকারি এই চাল-ডাল-নুন-তেলে আমরা দিনের-পর-দিন কী আন্দাজ ঠকে আসছি। দোকানীরা সব নাকি জোচ্চোর। যাতে তিনি নিজে এবং পাড়ার অন্তদশজন ভদ্রলোক সস্তায় ভালো জিনিষ পেতে পারেন তারই জন্যে এ ব্যবস্থা। দোকান চলে ভালো, না চলে জিনিষ তো তাঁর ফেলা যাবে না।

ছুটো গাড়ির আন্দাজ মস্ত গ্যারেজ-ঘরটায় একটা কাণ্ডকারখানা চলছে, আসতে যেতে সেটা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু ওটা যে মুদির-দোকানের জন্ম-পর্ব তা ভাবতে পারি নি। পারা সম্ভবও নয়।

বললাম, 'আমি তো ভেবেছিলাম ক্যাবিনেট ফারম খুলছেন।'

হেসে জবাব দিলেন, 'মুদিখানা ব'লে কি মনে করেছেন বেটাদের মতো ন্যাস্টি কিছু করবো! এ হবে একদম মডার্ন কায়দায়। বাঙলাদেশে এমনটি দেখেন নি। আসুন না, দেখুন এসে কেমন সব ব্যবস্থা করেছি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আসুন—চলুন দেখবেন, দেখে তারিফ না ক'রে পারবেন না।'

কাজ রেখে বাধ্য হ'য়ে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হ'লো।

প্রৌঢ় হাসিখুশি লোকটি। দেখলেই মনে হয় মনে নিটোল একটি শান্তি আছে। দোকানে ঢুকেই সগৌরবে সবগুলো আসবাবের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। 'কেমন মুদিখানা ব'লে মনে হয়?' মাটিতে শোয়ানো প্রকাণ্ড শো-কেসটা দেখিয়ে বললেন, 'চিনি, ময়দা, ডাল, মশলা, সব ঝাড়পোছ ক'রে ঢেলে দেবো এর খোপে-খোপে—এই মস্ত কাচের জারটায় থাকবে তেল, কলের মুখ খুললেই বস্, নিট চ'লে আসবে বোতলে। দেখবেন মেয়েরা পর্যন্ত শখ ক'রে সওদা করতে আসবে। বাজার ঘুরে শাড়ি পাউডার কিনবে, বাড়ির পাশের দোকান থেকে নিজেদের ভাঁড়ারের জিনিস কিনবে না, স্টাইল নষ্ট হয় যে—' একটু মুচকি হেসে বললেন, 'এই দেখুন একটা বিলিতি কাঁটা কিনেছি, জিজ্ঞেস করবো, মুসুর ডাল ক' পাউণ্ড—খুব একটা স্টাইল হবে, কি বলেন?' সুউচ্চ হাসি।

বুঝলাম উদ্দেশ্ত ব্যবসা নয়, নেহাৎই খেয়াল। একটা কিছু বলা দরকার, বললাম, 'ভারি সুন্দর করেছেন কিন্তু দোকানটি।'

'আরে মশাই সুন্দরটা বড়ো কথা নয়, কথা হ'লো এমনটি করতে খরচাটা কি করেছি। সেখানেই তো ক্রেডিট। বলুন তো দেয়াল-জোড়া এই শেলফ্‌টার দাম কত?' টক্‌-টক্ ক'রে শেল্‌ফের গায় টোকা মারলেন। 'পয়লানম্বর টিক, সাহেববাড়ির জিনিস—বলুন?' তিনি চার সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন। 'পারলেন না তো! ওয়ান-টুয়ানটিফাইভ—কিনেছি কভতে জানেন, ওনলি ফরটি। সমস্ত কলকাতা চ'ষে আসুন, পারবেন না জোটাতে এ দামে—ইম্‌পসিবল্‌।'

একে-একে কোন জিনিসটি কত সস্তায় কিনেছেন বা করিয়েছেন তার পরিচয় দিয়ে গেলেন। বললেন, 'ড্যাম চিপ-এ হ'য়ে গেল ব'লেই তো এত সব করা, নয়তো সত্যি কি আর স্টাইলের জন্তে করেছি। ওসব বাজে চালে আমি নেই মশাই।'

একটু পরেই যদিও মনে-মনে স্বীকার করতে হ'লো বাজে চালে তিনি নেই, কিন্তু উপস্থিত কথাটায় সায় দিতে পারলাম না।

সুধীবাবু ব'লে চললেন, 'জিনিস কেনা মস্ত একটা আর্ট, ও সবার আসে না—ন্তাক্ থাকা চাই। আসুন, আপনাকে দেখাচ্ছি আর দু'একটা জিনিস।'

পিছন-পিছন বেরিয়ে এলাম। বাড়ির ভিতর ঢুকছেন দেখে থমকে দাঁড়ালাম।

সুধীবাবু ডাকলেন, 'চ'লে আসুন। পাশের বাড়ি থাকেন, আপনি তো ঘরের লোক। লজ্জা কিসের!'

একেবারে উপর তলায় তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে হাজির। বিশেষ আদর-আপ্যায়ন ক'রে বসালেন। খুবই মন খোলা লোক, গলাটি তার চেয়েও বেশি খোলা—সব সময়েই যেন হাজার লোকের উদ্দেশে কথা বলছেন। হাঁকডাক ক'রে মেয়েকে দিয়ে একতাড়া চাবি আনালেন। পাশাপাশি সাজানো গোটা আটেক বড়ো-বড়ো ট্রাঙ্ক, পটাপট তালা খুলে ডালাগুলো তুলে দিলেন।

বললেন, 'বছর তিন আগে গিয়েছিলাম লাহোর আর কাশ্মীর। গরম কাপড় দেখলাম ড্যাম চিপ। আসুন এগিয়ে—এ সব কাপড়ের দর শুনলে আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না। অল্প মজুরিতে একটা ভালো দরজিও পাওয়া গেলো—এক সঙ্গে বেশি করালে দেখলাম আরও কম খরচা, পনেরটা কমপ্লিট স্যুট আর সাতটা ওভার কোট করিয়ে ফেললাম। জিনিষগুলো দেখে দামটা আঁচ করুন, তারপর বলছি, আগে ফাঁস করবো না। ছ'টা খানে এখনো হাত দেওয়াই হয় নি। এ দুটো ট্রাঙ্কে শুধু কাশ্মীরী শাল আর আলোয়ান।'

বললাম, 'য্যাদ্দিন ধ'রে আছি, আপনাকে কখনো তো স্যুট পরতে দেখিনি।'

'পরি নে, হয়তো পরবও না। সে কথা নয়, পারচেজটা কেমন হয়েছে তাই দেখুন। আমার ওয়াইফও বলেন, স্যুট তুমি পর না, এত টাকা খরচ ক'রে এতগুলো তৈরি করাবার দরকারটা ছিলো ক। আরে মশাই, খাঁটি দরকারের দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের বাটভাগ জিনিসই তো বাদ দিতে হয়—কি বলেন? এমন জলের দরে জিনিসগুলি পাচ্ছি, হাতছাড়া হ'য়ে যাবে! মাথা খুঁড়লেও পারবো আমি এখানে জোটাতে এ দামে।'

ব্যবসার বাইরে প্রয়োজন বা শখ ছাড়া এমন অদ্ভুত কারণেও যে মানুষ অর্থ ব্যয় ক'রে জিনিস কেনে, আমার জানা ছিলো না। এক বেলার পরিচয়ে উপদেশ দেওয়ার চেয়ে সায় দেওয়াটাই নিরাপদ। তা ছাড়া উপদেশরূপ বস্তুটি ওঁর মস্তিষ্কে ঢোকবার জন্যে এতদিন যাবৎ আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে, এটা মনে করাও অর্বাচীনতা। একে একে অনেক জিনিস দেখে এবং সঙ্গে-সঙ্গে জিনিস-কেনার আর্টের তারিফ ক'রে প্রথম দিনের পরিচয়পর্ব শেষ করলাম।

পুরোনো দোকান ছেড়ে সুধীরঞ্জনবাবুর দোকানের গ্রাহক হলাম। ভালো জিনিস সস্তা দরে দেবার প্রতিশ্রুতিটা তিনি ঠিকই রাখতে লাগলেন। মাঝেমাঝে সাক্ষাৎ হয়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দোকান সম্পর্কে প্রাণ ও গলা খুলে খানিকটা আলাপও করেন। অন্য দোকানীর চেয়ে অনেক ফিকিরফন্দিতে সস্তায় মাল কিনতে জানেন ব'লেই যে আমাদের এত কম দরে দিতে পারছেন, নানা নজির টেনে সেটাই আচ্ছা ক'রে বুঝিয়ে দেন।

একদিন রাত দশটায় সুধীরঞ্জনবাবুর মুক্তকণ্ঠনিঃসৃত আমার নাম শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

বললেন, 'নেবে আসুন মশাই, দেখুন এসে কী কাণ্ড করেছি।'

সুধীরঞ্জনবাবুর পিছনে ছ'সাতটা কুলির মাথায় একটা বিরাট বস্তু। নেবে আসতেই অসাধারণ চেষ্টায় গলা একটু খাটো ক'রে বললেন, 'আমেরিকান পিয়ানো টিপটপ কন্‌ডিশান, নিউ প্রাইস হাজার টাকা—মাত্র তিনশো টাকায় কিনে নিয়ে এলাম।'

খুশির প্রাবল্যে কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে চললেন। কুলিদের উপর 'হায়' সম্বলের হিন্দিতে বকাবকা ক'রে বিরাট বস্তুটিকে বাইরের

ঘরে একপাশে বসালেন। আমাকেও বসতে হ'লো। তিনি নিজে এসেছেন রিক্শাতে। রিকশাওলার মতে চার পয়সা সুধীরঞ্জনবাবু কম দিচ্ছেন। মিনিট পনেরো হল্লা আর বিতণ্ডার পর সুধীবাবু 'নেই দেঙ্গা' ব'লে দরজার কাছ থেকে স'রে এলেন।

রিকশাওলা চারটে পয়সার জন্যে যেমনই হল্লা করছিলো, তেমনি আবার খুবই হঠাৎ হুকুমটা মেনে নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেলো। সুধীবাবু সগৌরবে বললেন, 'আমার সঙ্গে চালাকি। মিথ্যে ব'লে চারটে পয়সা মেরে দেবার মতলব। কত সব ঘুঘুলোক কাণাকড়াটি ঠকাতে পারলো না আর—' কথা বলতে বলতে দরজার বাইরের কোণটায় হাত দিলেন। 'আমার ছাতা ?'

ছাতা নেই। বোঝা গেলো সেটা রিকশাওলাকে পুষিয়ে দেবার জন্যে তারই সঙ্গে গেছে।

'চুরি করলে আর কি করা যায়। ব্যাটারা পাকা চোর। আবার একটা ট্রাবল্, নয়তো বেটাকে—যাক্‌গে।' সুধীবাবু এগিয়ে এলেন।

এইমাত্র সাত শো টাকা লাভ ক'রে ফিরছেন। ছাতার কথাটা ভুলতে মুহূর্তও লাগলো না। পিয়ানোর সামনে ব'সে বেসুরো টোকা দিয়ে আমাকে দেখাতে লাগলেন যন্ত্রটা কি আন্দাজ সুরেলা। তারপর তার ক্রয়ের ইতিহাস। শেষ ক'রে বাড়ি ফিরতে এগারোটা।

এর কিছুদিন পর একখানা পুরোনো স্ট্যানডার্ড গাড়ি দেখা গেলো দিন দুই ধ'রে সুধীবাবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে-ধরনের গাড়ি, হর্ন ছাড়া যার সব অঙ্গই আওয়াজ করে। নিশ্চয়ই এমন একটা মূল্যে পেয়েছেন, না কিনে থাকতে পারেন নি। আস্তাবলে দোকান তাই চট মুড়ি দিয়ে ফুটপাতের গা ঘেঁষেই প'ড়ে থাকতে হলো। নতুন

মালিকের কাছ থেকে খুব খানিকটা সেবা যত্ন আদায় ক'রে দিন কয়েক পর কোথায় স'রে পড়লো বলতে পারি না। সুধীবাবুকে এটা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করতে শুনিনি—জিত সম্বন্ধে বোধহয় নিজেরই সন্দেহ ছিলো।

একদিন বাড়ির ভিতর হ'তে নালিশ এল, দোকান থেকে ঠিক মতো জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। চিনি আছে তো ময়দা নেই, ময়দা আছে তো ঘি নেই। সুধীবাবুকে জানাতে গিয়ে যা জেনে এলাম তাতে বোঝা গেলো আমাদেরই উপকারার্থে এই সাময়িক অসুবিধার সূত্রপাত। সস্তায় ভালো গব্যঘৃত আমদানির জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে গ্রামে, ভরসা ঘি আর আটা আসছে বিহার থেকে, চিনির জন্যে জাভা না হলেও ওরকমই একটা কিছু আয়োজন চলেছে। অতএব ধৈর্য ধরতে হবে।

কিন্তু ধৈর্য অধিক দিন রাখা গেলো না। রাখতে হলে রান্নাঘরের পাট ওঠাতে হয়। প্রশ্ন ক'রে সুধীবাবুকে বিব্রত করার ইচ্ছা ছিলো না। দেখা হলেই পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতাম।

বিশেষ প্রয়োজনে কিছু দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে যেতে হলো। ফিরে এসে দেখি মুদিখানার নোংরা জিনিস গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দোকানটা পুরোনো আসবাবের দোকানে দাঁড়িয়ে গেছে। বিরাট বপুর পিয়ানোটিও এসে সঙ্গে জুটেছে। যার যা মূল্য আঁটা রয়েছে কপালে।

আমাকে দেখতে পেয়ে সুধীবাবু ডাকলেন। ভিতরে যেতেই বলতে লাগলেন, 'কিনবি না বাপু সে তো জানি? মিছিমিছি বদনাম করিস্ কেন! দাম বেশি ফেলা হয়েছে—ননসেন্স।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?'

'আরে মশাই, এই পাশের বাড়ির লোকটা।'

সুধীবাবুর মন ও মেজাজ যে বিশেষ ভালো অবস্থায় নেই দেখেই বোঝা গেলো। শোবার ঘরের দু'একটা আসবাবও যখন দোকানে এসে খাড়া হয়েছে—পকেটে টান পড়েছে নিশ্চয়। অবস্থা ভালো হতে পারে, কিন্তু খেয়ালের ঝোঁকে যা ক'রে বেড়াচ্ছেন তাতে এটাই স্বাভাবিক। এমনিতে লোকটি বড়ো ভালো। মনে মনে দুঃখ বোধ করলাম।

পিয়ানোটার দাম লেখা হয়েছে দু'শো টাকা। প্রয়োজনের তাগিদে একশো টাকার লোকসানটা মেনে নিতে হয়েছে। খানিকটা সহানুভূতি, কিছুটা শখ বা সস্তার সংক্রম থেকেই বললাম, 'পিয়ানোটা বিক্রিই যখন করছেন, আমাকেই দিন।—কিন্তু আমার মনে হয় অপেক্ষা করলে এটার জন্যে ভালো দাম দেবার লোক আপনি পাবেন—এমনকি বেশ কিছুটা লাভ রেখেই ছাড়তে পারবেন।'

সুধীবাবুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'না মশাই এর কদর কটা লোক বোঝে।'

মনে হলো হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। ভাবলাম, টাকাটা গিয়ে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেবো।

সুধীবাবু ব'লে চললেন, 'দোকানে ঢুকে জিনিস না কিনে বেরিয়ে যায় তাতে বলবার কিছু নেই, কিন্তু দামটা যা ফেলেছি সেটা যে য়্যাপ্রিসিয়েট করে না, তাইতে আমার গা জ্বলে যায়,—আপনি যখন নিচ্ছেন, পাশের বাড়ির লোক, যান—দিলাম আরো পঞ্চাশ টাকা

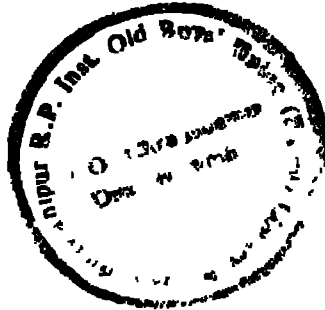
ছেড়ে। দেড়শো টাকা—হোয়াট এ প্রাইস! দশজনকে দেখিয়ে গৌরব ক'রে বলতে পারবেন।'

আনন্দে ও উৎসাহে সুধীবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চাকর ডেকে তক্ষুণি পাঠিয়ে দিলেন কুলি আনতে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। সস্তায় কিনে যতটা আনন্দ ও গর্ব বোধ করেছিলেন, সস্তায় দিতে পেরেও সেই আনন্দ ও গর্ব তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু মনে করবেন না সুধীবাবু, জিনিসগুলো কেন বিক্রি করছেন জানতে পারি ?'

'আরে মশাই, পঞ্চাশ টাকা ক'রে বিঘে যাচ্ছিলো, দুশো বিঘে জমি কিনে রেখেছিলাম দেশে। শুনলাম লেবার ওখানে ভারি চিপ যাচ্ছে। জমিটাকে কাজে লাগানোর এই সুযোগ। ঠিক করেছি 'ফারমিং' করবো—কিন্তু টাকা পয়সার একটু টানাটানি যাচ্ছে তাই—'

কথা শেষ হবার আগেই কুলি এসে পড়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।



লেডিজ সিট

ধার-করা গ্রামোফোনের মতো মা'র মুখের কামাই নেই—চলছেই, শুধু তাই নয়, কাটা-রেকর্ডের মতো এক কথা একশো বার 'খোকা তুই বিয়ে কর'। মা'র সস্নেহ সম্বোধনে আটকা-পড়া অটুট শৈশবের মতো অটুট সঙ্কল্প নিয়ে আমিও জীবনের পঁয়ত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিলাম শুধু এই ব'লে—ত্যক্ত কোরো না, বাজে কাজের সময় আমার নেই। নতুনত্ব বর্জিত প্রশ্ন এবং প্রতি-উত্তর। শুরুতে তাই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নজীর টেনে উপহাস করতেও কম করেনি। কিছুদিন হলো আমার বয়সের সংখ্যাটা হিসেব করে তারা সব হয়ে গেছে নীরব। আমার সঙ্কল্পের সত্যতা সম্পর্কে তাদের সকৌতুক সন্দেহ আজ প্রকৃতই ঘুচে গেছে। কিন্তু বাইরের লোকের বিশ্বাস অর্জন করা যখন হয়ে গেলো, অন্তরলোকের বিশ্বাসে এল দ্বিধা। অনেকটা অভ্যাসের বশে অস্বীকার ক'রে চলি, কিন্তু সেই অস্বীকারে পূর্বের জোর ও অন্তরের সায় যেন আর খুঁজে পাই না। নিজের এই পরিবর্তনটুকু শুধু উপলব্ধি করি, কিন্তু ধীরে ধীরে এ পরিবর্তন কেন আসছে তার কারণ তলিয়ে দেখবার চেষ্টা কখনো করি নি।

অর্থনীতির একটা সমস্যা নিয়ে দিন কয়েক যাবৎ বড়োই বিব্রত হয়ে পড়েছি. কোনো রকমেই একটা মীমাংসায় পৌছানো যাচ্ছে না। দিনটা রবিবার। অর্থশাস্ত্রের এক সহকর্মী অধ্যাপকের সঙ্গে এ বিষয়ে

কিছুটা আলোচনা করবো মনে করে দুপুর বেলায় তৈরি হচ্ছিলাম বেরুব ব'লে। মা এসে অনুরোধ করলেন, আমার হস্তপ্রার্থিনী একটি কুমারীকে দর্শন ক'রে ছুটির দিনটা সার্থক ক'রে তুলতে। দস্তুরমতো থম্‌কে উঠে ছাতা হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

দুপুরের রৌদ্রে টালিগঞ্জের জনবিরল রাস্তার ফুটপাথ ধ'রে এগিয়ে চললাম একটা 'বাস-স্টপে'র উদ্দেশে। মা'র মুখ-ভাবটা মনে প'ড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ভাবলাম, আঘাতটা ও-রকমে না দিলেও তো পারি—এর পর থেকে অস্বীকারই করবো, অপমান আর করবো না।

'বাস-স্টপে' পৌছে একটা গাছের ছায়ায় ছাতা ভর দিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম উল্‌টো দিকের গলি থেকে হনহন ক'রে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর বেশ কিছু পিছনে আধ-ঘোমটা দেওয়া একটি মহিলা এবং তাঁর হাত ধ'রে ছুটতে ছুটতে আসছে ছ'সাত বছরের একটি ছেলে। ভদ্রলোকটির গতির সঙ্গে সমতা রেখে চলার আপ্রাণ চেষ্টা থেকে শুধু বোঝা যায় পশ্চাতের প্রাণী দুটি তাঁর সহযাত্রী। একটিবার পিছনে পর্যন্ত না তাকিয়ে লোকটি বরাবর রাস্তা পেরিয়ে এসে আমারই মতো বৃক্ষছায়ে আশ্রয় নিয়ে মস্ত একটা হাঁপ ছাড়লেন। বুঝলাম উদ্দেশ্য এক। ভদ্রলোকের ঘর্মাক্ত মুখে বিরক্তি আর চাপা ক্রোধের স্পষ্ট অভিব্যক্তি।

মহিলাটি ছেলের হাত ধ'রে এসে দাঁড়ালেন খানিকটা তফাতে। আধুনিক না হ'লেও পৌরাণিক হয়ে না থাকার কিছু চেষ্টা তার পরিচ্ছদের মধ্যে ধরা পড়ে। পায়ে এক জোড়া ধূলি-মলিন স্যান্‌ডেল। পুরানো লজ্জা নতুন ঘোমটায় সামাল দেবার চেষ্টায়, ডান দিকে ঝুলেপড়া আঁচলটাকে বাঁ দিকে এতটা টেনে ধরা হয়েছে যে মুখের

অর্ধেকটাই গেছে ঢেকে। চেষ্টা ও সুবিধার অভাবে মুখখানা ভালো ক'রে দেখা হয়ে উঠলো না।

মহিলাটি এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক দাঁতে দাঁত চেপে ক্রুদ্ধ চাপা কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—কেন পিছু পিছু আসছো? বাবার টাকা আছে তোমার, তারই কাছে থাকগে যাও, আমার কাছে স্থান হবেনা—নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার!

ব'লেই পুনরায় জোর হাওয়া খেতে শুরু ক'রে দিলেন। গলা চেপে বলায় চাপা পড়লো না কিছুই; শুধু প্রকাশ পেলো তাঁর শেষ কাণ্ডজ্ঞানের নিষ্ফল চেষ্টা। উভয়ের সম্পর্কটা সহজেই আঁচ করা যায়। কিন্তু দিনদুপুরে রাস্তায় তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে স্বামীর এরূপ ক্রোধ-প্রকাশ এবং নির্লজ্জের মত নির্লজ্জ ব'লে গালিগালাজ, নিজের কানে না শুনলে বা নিজের চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাসই করতাম না।

স্ত্রীর তরফ থেকে কোনো জবাব এল না। আমার উপস্থিতিটাই হয়তো তার কারণ। স্বামীর প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করতেই তিনি আরও জ্ব'লে উঠে অভিনয়ের ভাষায় বললেন—রাক্ষুসীর মতো তাকিও না—অনেক রক্ত চুষে খেয়েছো, আর দিচ্ছিনে, এই শেষ—

লোকটির দেহের দিকে তাকালে কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে তিনি দাঁত খিঁচিয়ে ব'লে উঠলেন—বাপের বাড়ি প'ড়ে থেকে ওরই সঙ্গে ভাব করগে যাও—রাসকেল।

স্ত্রীকে যার সঙ্গে ভাব করার অনুমতি দিয়ে স্বামী শেষ বিদায় নিচ্ছেন তার ইতিহাস আমার জানা নেই; কিন্তু দাম্পত্য কলহের যে অংশটুকু আমার সামনে ঘটলো, সেটুকুই এত কুৎসিত যে সেখানে

দাঁড়িয়ে থাকতে পর্যন্ত অস্বস্তি ও লজ্জা বোধ করছিলাম। চার-পাঁচ মিনিটের অভিজ্ঞতায় অবিবাহিত জীবনকে সমর্থন করবার যেন মস্ত একটা যুক্তি খুঁজে পেলাম। ভাবলাম, এই তো হয়।

ব্যাপারটাকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে দেখতে দেখতে একটা বাস দ্রুতগতিতে এসে হুমড়ি খেয়ে আমাদের সামনে থেমে পড়লো। উঠে একটা সিটে গিয়ে ব'সে পড়লাম। ভদ্রলোকটি আর একটা বেঞ্চিতে জানলা ঘেঁসে ব'সে তার ফ্রেমের উপর রাখলেন হাত, হাতের উপর রাখলেন মাথা। স্ত্রীলোক দেখে বাস তার মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রে একদম দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। ব্যস্ত হয়ে কণ্ডাকটর বললো—চলে আসুন—জলদি! জলদি তো দূরের কথা, মহিলার তরফ থেকে আসবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তিনি যেমন ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কণ্ডাক্টার ঠং ঠং দুই ঘন্টি মেরে দিতেই বাস ছেড়ে দিলো। স্ত্রীপুত্রকে সত্যি সত্যিই রাস্তায় এমনভাবে ফেলে যাবে ভাবতে পারি নি। ইচ্ছা হলো লোকটার গালে একটা চড় ক'ষে দিয়ে নেবে পড়ি, তারপর পৌঁছে দিয়ে আসি ওঁদের, যেখানে ওঁরা যেতে চান। বাসশুদ্ধ কৌতূহলী হ'য়ে ভদ্রলোকের দিকে, এবং মাথা ফিরিয়ে মহিলাটির দিকে বার-বার তাকাচ্ছিলো। জানালা দিয়ে পিছনে তাকাতেই দেখতে পেলাম মহিলাটি হাত তুলে দাঁড়াতে ইসারা করলেন। কণ্ডাকটারও সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই চেয়ে ছিলো, ঠুং ক'রে একটা ঘন্টি দিয়ে বললো, একদম্ রোক্‌কে।

ছেলের হাত ধ'রে ত্রস্তে এগিয়ে এসে মহিলাটি বাসে উঠলেন। ভদ্রলোক টক্ ক'রে জানলার ধারের সিটটা ছেড়ে এমনিভাবে পথ ক'রে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, যেন এই কথা ছিলো। তারপর স্ত্রীর পাশে

যেমন ক'রে বসলেন, মনে হলো একটা ছেদ টেনে দিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রইলেন বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে।

চলতি বাসে ব'সে আছি। চোখের উপর দিয়ে অর্থশূন্য ভাবে ভেসে যেতে লাগলো যত সাইনবোর্ড ও বিজ্ঞাপন, আর মনের উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগলো গুচ্ছার এলোমেলো চিন্তা। বিবাহ এবং সমাজে নারীর স্থান থেকে শুরু করে শিক্ষা, সংস্কৃতি কোনটাই তার মধ্যে বাদ পড়লো না।

একটা ষ্টাণ্ডে এসে বাস থামলো। কণ্ডাকক্টার হেঁকে বললো— লেডিজ সিট ছেড়ে দিন!

একটি তরুণীকে আমার বেঞ্চির কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে বুঝলাম আদেশটা আমাকে উদ্দেশ্য ক'রেই দেওয়া হয়েছে। উঠে পিছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। একটি যুবক তরুণীটিকে নিয়ে বেঞ্চিখানা জুড়ে বসলেন। তরুণীটি সুন্দরী এবং বিবাহিতা। তাদের ক্ষীণ কণ্ঠের দু'একটি কথা কানে আসতেই বুঝলাম সঙ্গের যুবকটি তার স্বামী।

তরুণীটি আসার পরেই বাসের লোকগুলি যেন হঠাৎ হয়ে উঠলো চঞ্চল ও মুখর। উপস্থিত বা ভবিষ্যতে কোনো আশা নেই, তবু চুলগুলো যার কপালের উপর এসে পড়েছিলো, দিলো পিছন দিকে ঠেলে, কেউ সার্টের কলারটাকে দিলো উল্টে, কেউ নিচের ঠোঁটের একটা কোন্‌কে বাঁকা ক'রে দাঁত দিয়ে চেপে গম্ভীরভাবে শুরু করলো পা নাচাতে।

ঠিক পিছনে বসেছি ব'লে স্পষ্ট শুনতে পেলাম যুবকটি আস্তে আস্তে বলছেন—দু'দিন তো লাগলো অভিমান ভাঙতে—এ ভাবে দিনগুলো নষ্ট ক'রে লাভ কি?

তরুণীটি কোনো জবাব না দিয়ে তাকালো যুবকটির চোখের দিকে। কি এক নেশায় আচ্ছন্ন উভয়ের দৃষ্টি। আমার প্রাণেও এসে যেন তাঁর ছোঁয়াচ লাগলো। আর একটু হ'লে বুঝি-বা একটা দীর্ঘশ্বাসই ছেড়ে দিতাম। পাশে চেয়ে দেখি পুরাতন দম্পতি তখনও বসে আছে উলটোউলটি তাকিয়ে।

গন্তব্যস্থানে বাস এসে পৌঁছলো। নামতে যাচ্ছি, শুনলাম কণ্ডাকটর বলছে—পথ ছাড়ুন, মেয়েদের উঠতে দিন।

ম্যাস উইথ কেয়ার—একপাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পথ ছাড়া, সিট ছাড়া নিয়ে জুলুমটা যেন সব আজ এসে পড়ছে আমার উপরেই। কোনো কিছুই যে আমি ছাড়ছি নে, ধমক দিয়ে সেটাই যেন জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাকে।

রঙিন কাপড়ের বেঁটে ছাতা হাতে প্রথম প্রবেশ করলো যে তরুণীটি তাকে অত্যন্ত কৃশাঙ্গী বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাদা জরির পাড়টা নতুন ধরনে দেহকে ঘিরে পা থেকে স্পাইরেলের মত বেয়ে উঠেছে কাঁধ পর্যন্ত। স্বল্প কাপড়ের দামী ব্লাউসটা যুবকদের ব্যগ্র দৃষ্টির বিপক্ষে সগর্বে শত্রুতা করতে না পেরেই যেন ক্ষুব্ধভাবে নেতিয়ে পড়েছে তার বুকের উপর। পিছনে যে-টি উঠলো, পরিচ্ছদ থেকে দৃষ্টি কেড়ে নেয় তার স্বাস্থ্য ও রূপ।

নামতে গিয়ে নামা হলো না। দশ বছর পূর্বের দৃষ্টি ও মন যেন নতুন ক'রে ফিরে এসে জয় ক'রে বসেছে আমাকে।

বাসের স্টার্ট নেওয়ার ধাক্কা সামলাতে না পেরে পিছনের তরুণীটি পড়লো এসে আমার গায়। সামলে উঠে একবার আমার দিকে তাকালো—হরিণাক্ষী না বললেও 'হরণাক্ষী' তাকে বলতেই হয়।

পরের 'স্টপে' চট ক'রে নেবে পড়লাম। হঠাৎ নিজের এত বড়ো একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। বহুদিন হয়ে গেলো এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটা সজাগ কখনও হয়েছি ব'লে মনে পড়ে না।

এককালে অর্থ রোজকারের প্রতি লোভটা ছিল প্রচুর। একদিন যখন টের পেলাম অর্থের চেয়ে অর্থনীতিতেই আনন্দ পাই বেশি—স্থির ক'রে ফেললাম সকল অভাবকেই তুচ্ছ ক'রে চলবো এই এক সম্পদকে সম্বল ক'রে। জ্ঞান-বুভুক্ষার খোরাকে টান না পড়ে এমনি ক'রে মনের আনাচ-কানাচ পর্যন্ত ভরিয়ে রাখবো অর্থনীতির তথ্য দিয়ে। কিন্তু আজ যেন বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম, মন ছাড়াও আর একটা বস্তু আছে যাকে বুঝিবা তুচ্ছ করা চলে না।—

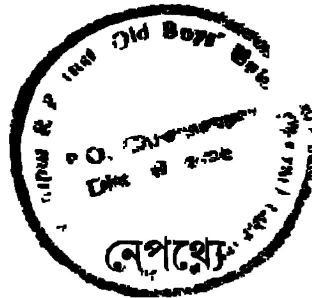
ধীর পদক্ষেপে ফুটপাত ধ'রে এগিয়ে চলেছি। চিন্তার লক্ষণস্বরূপ একটা হাত ধীরে ধীরে উঠে চিবুক স্পর্শ করতেই আঁতকে উঠলাম। মনে হ'লো যেন হাতটা গিয়ে ঠেকলো একটা সুইপারের ব্রুসে। একে একে একে সমস্ত পরিচ্ছদটার দিকে নজর পড়লো। কলেজে পড়বার সময় পর্যন্তও দস্তুরমতো বিলাসী ছিলাম ব'লেই মনে পড়ে। সে-সব শখ যেন কি ভাবে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। আধময়লা পাঞ্জাবিটার উপরের পকেটে রুমালের স্থানটা জুড়ে আছে কয়েকখানা পুরানো চিঠি। তিন পয়সা মূল্যের পোস্টকার্ডটাই তার মধ্যে সবচাইতে উদ্ধত, আত্মগোপন না ক'রে মাথা উঁচু ক'রে আছে সেটাই। নিচের একটা পকেট খালি, অন্যটার মধ্যে টাকা-পয়সা থেকে শুরু ক'রে বিস্তর কাগজপত্র—ফলে জামার একটা কাঁধ পড়েছে বিচ্ছিরি রকমে ঝুলে। জুতোটার সর্বাঙ্গ কীর্তন করছে মুচীর মহিমা। ছাতাটা বিরাট

ক্লান্তিতে শিথিলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তার আকাশমুখো মস্ত হাঁ দেখে মনে হ'লো যেন যত জল সবই নিরর্থক ব'য়ে গেছে তার পিঠের উপর দিয়ে, বুক জোড়া তার বিরাট তৃষ্ণা; জোর ক'রে মুখ বুজে স্মার্ট হ'য়ে চলার ক্ষমতা তার হারিয়ে গেছে। কি ভেবে ছাতাটাকে জড়িয়ে ফেললাম ডাটের সঙ্গে, এঁটে দিতে গিয়ে দেখি স্ট্রাপটা নেই।

পরিচ্ছদ থেকে মনটা ছুটে গিয়ে মুহূর্তে একবার প্রদক্ষিণ ক'রে এল আমার শৃঙ্খলাহীন নোংরা ঘরটাকে। নিজের সম্পর্কে সকল বিষয়ে এতখানি অবহেলার ভিতর ঔদাসীন্য খুঁজে পেলাম না, যা পেলাম সে একটা একটানা শ্রান্তি, একটু প্রেরণার অভাব। বিদ্যাচর্চা বা বয়স কাউকে দায়ী করতে পারলাম না বয়সের কথা মনে হতেই তারিণী ঠাকুরদা'র চতুর্থপক্ষ গ্রহণের সাজ-পোষাকটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

বাঙালী-জীবনের সঙ্কীর্ণ শ্রেষ্ঠাংশটুকু জোর ক'রে এড়িয়ে এসেছি ব'লে সত্যিসত্যিই আজ দুঃখ হ'লো। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে কানে বেজে উঠলো কণ্ডাকটারের সেই জোর গলায় হাঁক, 'লেডিজ সিটটা ছেড়ে দিন মশায়!'—

মুহূর্তে ঠিক ক'রে ফেললাম, ছেড়েই দেবো, বসাক এনে যা যাকে খুশি।



নেপথ্যে

মেয়ে-স্কুলে একজন মাস্টার চাই। রমেন এসে বলে—দাওনা একটা দরখাস্ত ছেড়ে, য়্যান্টিসেপ্‌টিক তো হয়েই আছ। সাদি করি নি, না হয় সাধ যে না যায় তা নয়। মাড়োয়ারীকে দেখে আঁচ করা যায় না তার কত টাকা, তোমারও তেমনি, চেহারায় ধরা পড়ে না ভেতরের ভাব বুদ্ধি— লেগে পড, হয়ে যাবে।

চুপ ক'রে শুধু হাসি। আজ পাঁচ বৎসর, পণ ক'রে পণ্য দ্রব্য হয়ে চাকরির বাজারে পড়ে আছি—, দরখাস্ত একটা দিই।

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ডাক আসে। দু'জন উমেদার, যোগ্যতা দু'য়েরই সমান। আমাকেই পছন্দ করে, বোধ হয় চেহারার গুণে। বলে আসবেন কাল থেকে। অপর লোকটি বিফল হয়ে যাবার সময় একটা খোঁচা দিয়ে যায়। বলে—বেশ ভালো ব্যাকিং ছিলো, আমার দিকে তাকিয়ে ওঁরা ওঁদের মেয়েদের দিয়ে ভরসা পেলো না বোধ হয়। যাক—চাকরিটা গেলো কিন্তু পুরুষত্বের গৌরবটা তো বজায় রইলো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে যেতে যেতে বলি—এখানে ছুটে এসেছি বজায় রাখতে অস্তিত্ব, পুরুষত্ব-নয়।

বাড়ি ফিরে আসি। সুরমা শুনে খুশিই হয়, তবু মনে হয় তার মধ্যে যেন একটু 'তবে' আছে। স' পাঁচ আনা খরচ ক'রে হরির লুট দেয়। চাবি শুদ্ধ আঁচলটাকে গলায় জড়িয়ে তুলসী-মঞ্চের সামনে গড়

হ'য়ে হরির উদ্দেশে প্রণাম করে—বোধহয় প্রার্থনা করে আমার চাকরি ও মন দু'টোর উপরই একটু নজর রাখতে।

স্কুলে যাই, হেড্‌মিস্ট্রেসের দিকে তাকিয়ে একবার একটু দেখে নিয়ে হাত তুলে নমস্কার জানাই। কিঞ্চিত স্থূল, কিন্তু তা ব'লে দেখতে নেহাৎ মন্দ নন, তবে কারুর ভালবাসার পাত্রী ব'লে ধারণা করা যায় না। মুখ ও স্বর ধ্রুপদের মতো গম্ভীর। বলেন—অঙ্কের ক্লাস নিতে হবে, বসুন ওখানে, কেরানী বাবুকে ব'লে দিচ্ছি রুটিনটা ক'রে দিতে।

ক্লাসে যাই। গণিতের ভাণ্ডার নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন পরিমাণ বিতরণ ক'রে বেড়াই। পড়াবার সময় বিশেষ ক'রে কারো দিকে বড়ো একটা তাকাই না, দৃষ্টিটাকে চালিয়ে দিই সকলের মাথার উপর দিয়ে। বয়েসটা অল্প, সব রকমেই সাবধান হয়ে চলি। কি করতে কি করবো, ব'লে বসবে উৎসাহের আতিশয্য।

সুরমা বলে—কামিয়ে যাও মুখটাকে, খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে যে ছেয়ে গেছে। তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর করি—থাক আজ, কাল রব্‌বার কালই কামাবো। শেষ পর্যন্ত তার অনুরোধ না এড়াতে পেরেই যেন কামিয়ে যাই।

স্কুল থেকে ফিরে শ্রান্ত দেহটাকে ভাঙা ইজি-চেয়ারে এলিয়ে দিই। সুরমা জলখাবার সামনে দিয়ে খুটিনাটি কত খবরই না জিজ্ঞেস করে। হঠাৎ প্রশ্ন করে—আচ্ছা তোমার সব ছাত্রীই আমার চাইতে সুন্দর, না? বলি—অত খেয়াল ক'রে তো দেখি নি। তোমার চেয়ে সুন্দর হলে চোখে ঠেকতো হয়তো। সুরমা বিশ্বাস করে না, তবু খুশি হয়।

তৃতীয় শ্রেণীতে ক্লাশ নিতে বড়ো অসুবিধে হয়। পাশের ক্লাশে মিস্ দত্ত ইংরিজি পড়ান। শিক্ষয়িত্রীর অসংখ্য ভুল, ছাত্রীদের অশ্রান্ত

কোলাহল কানে এসে পৌছয়। বোর্ডে লিখতে লিখতে থেমে পড়ি; একবার মনেও হয়, যাই, অনুরোধ ক'রে আসি গণ্ডগোলটা থামাতে। আবার ভাবি, আনন্দ-লোক থেকে এসেছে যার আমন্ত্রণ, এ কাজে এসেছে যার শ্রান্তি, শান্ত করবার কঠোরতা সে পাবে কোথায়? আর যাচ্ছেনই তো চ'লে মাস দুই পরে এই ব্যর্থতার হাত এড়িয়ে জীবনটাকে সার্থক ক'রে তুলতে।

এক এক দিন এসে তিনি বলেন—চপলাদির মত আছে,—দয়া ক'রে যদি আমার ক্লাসটা—মাথাটা কেমন যেন করছে। মনে মনে বলি, মাথাটা না মনটা। কিন্তু অমত করিনে। ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে দ্রুত চ'লে যান গেটের দিকে। আবার ফিরে এসে বলেন,—দেখুন না কি অন্যায় আমার, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত জানিয়ে যেতে ভুলে গেছি। সত্যিই আপনি ইয়ে না করলে—কৃতজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়ে ওঁর ছুটির প্রয়োজনীয়তা। কে একটি যুবক গাড়িতে তুলে নিয়ে চ'লে যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাই। প্রথম দিন নামের তালিকা খুলে ডাকতে ডাকতে থেমে পড়ি; নামটা বিশেষ ক'রে নজরে পড়ে, ডাকি—বুলাকি সেন! দাঁড়িয়ে বলে—উপস্থিত। একবার তাকিয়ে দেখি, নিজের চোখও যেন ব'লে উঠতে চায়—'উপস্থিত'। ফুট্-ফুটে রং, টানা-টানা চোখ, লাবণ্য আর দুষ্টুমি যেন মাথামাথি হয়ে ছেয়ে আছে মুখ-খানিকে। দু'পাশ দিয়ে লম্বা দু'টো বিনুনি ঝুলে পড়েছে ঠিক ইরাণী-দের মতো। নামের তালিকার মতো ওখানেও চোখ থেমে পড়তে চায়, জোর ক'রে নাবিয়ে আনি। সমষ্টিকে লক্ষ্য ক'রে পড়াতে শুরু করি, পেরে উঠিনে। বুলাকি বড়ো চঞ্চল, সকলের মধ্যে সে হারিয়ে যায় না। বাধ্য হয়ে তার সত্তা আমাকে স্বীকার করতে হয়।

অঙ্ক কষতে দিই। মীরা নাকি স্থরে বলে—দেখুন না মাস্টার মশাই, বুলাকি কি সব বলছে? বলে তোর ওপরের ঠোঁটটা বেঁকেও ব্র্যাকেটের মতো।

জিজ্ঞেস করি—তোমার অঙ্ক হয়েছে বুলাকি?

মীরা ফস্ ক'রে বুলাকির হাত থেকে খাতাটা নিয়ে টেবিলের উপর রেখে যায়। খোলা পাতাটার উপর তাকিয়ে দেখি লেখা রয়েছে, 'অরুণার মুখটা সিম্প্লিফাই করলে সব মিলে গিয়ে ফল হয় ডবল শূন্য, সে দু'টো ওর চোখ। ক্লাস রুম থেকে মাস্টার মশাই বাদ গেলে থাকে শুধু মেয়েরা—উঃ কি মজা!'—এমনিধারা কত কি ছেলেমানুষি কথা। রাগ হয় না বরং হাসি পায়। তবু গম্ভীর হয়ে বলি—রইলো খাতাটা, হেডমিস্ট্রেসকে দেখাবো। বুলাকির চোখ দুটো ছলছল ক'রে ওঠে। যাবার সময় খাতাটা দিয়ে ব'লে যাই, ভবিষ্যতে এমন হলে মাপ করবো না।

পরের দিনও তেমনি। দুষ্টুমি তার লেগেই আছে। বুলাকির দিকে নজর না দিতে চেষ্টা করি, মন ও চোখ ব্যাপ্তি ঘুচিয়ে বিশেষ কোথায় যেন আশ্রয় খোঁজে। শ্রেণীর প্রথম মেয়ে সাহানা, সাহানারই মতো করুণ তার মুখ, রং তার খুবই ময়লা, সুশ্রী তাকে কোনো রকমেই বলা চলে না। তারই কাছে গিয়ে দাঁড়াই, পরিচয় করি, তারই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে পড়িয়ে চলি। দিন যায়, সবাই বলে, সাহানা আমার প্রিয় ছাত্রী—কেউ তা'তে অপরাধ নেয় না।

হেডমিস্ট্রেসের কাছ থেকে ডাক আসে। তেমনি ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে দাঁড়াই। আদেশের স্থরে বলেন—কেরানীবাবুর বড্ড কাজ পড়েছে, অবসর সময় ওঁকে এসে একটু সাহায্য করবেন।

স্নেহ ভালবাসার বাইরে মেয়েদের কাছে থেকে আদেশের সুরটা কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে। রাজি হ'য়ে ফিরে আসি।

টিফিনের সময় বারান্দার বেঞ্চির উপর ব'সে থাকি। সামনের খোলা জায়গায় কত মেয়ে ছুটো-ছুটি করে। কতক ঘুরে বেড়ায়, কতক বা এখানে ওখানে দল বেঁধে ব'সে গল্প করে। বেশ লাগে দেখতে, যেন তুচ্ছ বুনো ফুলের এক একটা গুচ্ছ। বিশেষ ক'রে কারুরই সত্ত্বা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না, তবু সবাই মিলে তারা বেশ সুন্দর হয়ে উঠে। খানিকটা দূরে জামরুল গাছের নিচে বড়ো মেয়েরা বসে অবিশ্রাম কথা ব'লে চলে, ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করি এর মধ্যে শ্রোত্রী কে। ভাবি, নারী ও নীরবতার দ্বন্দ্ব আজও ঘুচলো না।

বুলাকি কোথা থেকে স্যাণ্ডালটাকে চট-পট করতে করতে করতে ছুটে আসে। দারোয়ানকে বলে—দাওতো এক পয়সার কুল। কুল-গুলি মুঠো মুঠো গলার কাছ দিয়ে সেমিজের মধ্যে গলিয়ে দেয়। বাঁ হাতের স্তনের উপর একটা কুলকে বার দুই জোর ক'রে টিপে টপ ক'রে মুখে ফেলে। তার পরেই গালের কাছে হাত নিয়ে নাক কুঁচকে মুখটাকে একটু ফাঁক ক'রে বলে—বাব্বাঃ কি টক! আবার খেতে থাকে, মুখের ভাবে ধরাই পড়ে না টকত্বটা কুলের দোষ না গুণ।

একটু কথা বলতে ইচ্ছে হয়। ডেকে বলি—টক কুল খেয়ো না, কাসি হবে যে।

দাঁতে দাঁত চেপে মুখে তৃপ্তি-সূচক শব্দ ক'রে জবাব দেয়—অমন কত খাই কিচ্ছু হয় না আমার। আচ্ছা মাস্টারমশাই, অঙ্ক কষ্‌তে আমার মোটেই ভালো লাগে না কেন বলুন তো? দেখবেন, এবার অঙ্কে পাবো আমি শূন্যি।

দেখবার আগেই এ সত্য আমি মনে মনে স্বীকার করি। মুখে বলি—একটু মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করলে সেরে নেবার ঢের সময় আছে এখনো।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকে ঝোঁকটা একটু যেন বেশি বোধ করি। মাঝে মাঝে বুলাকি স্কুলে আসে না, বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়, পড়াতে আর তেমন উৎসাহ পাইনে।

ভূগোলের টিচার মদনবাবু এসে বলেন—কি নামটাই না করেছেন স্কুলে। টিচার স্টুডেণ্ট সবাই বলে এমন লোক নাকি হয় না। নোটিশ পেয়েছেন নিশ্চয়, থাকবেন তো আজ টিচার্স মিটিং-এ?

স্বভাব চরিত্রের প্রশংসায় আমার কায়েমী স্বত্ব, শুনতে শুনতে সয়ে গেছে, নতুন ক'রে আনন্দ দেয় না।

ছুটির পর সভা বসে। স্বজাতিদের পাশে গিয়ে ব'সে পড়ি। অপর দিকে দুটো বেঞ্চে বসেন মেয়ে-টিচাররা মনে মনে ভাবি, হতো যদি এটা সয়ম্বর-সভা দু' পক্ষই থাকতো চোখ বুজে। আমাদের বেছে নিয়েছে কমিটি, ওদের য়ুনিভারসিটি। দু'একজনের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় কোনো দিন একটু ছিলো, বোধহয় শুষে নিয়েছে বইয়ের পাতায়, ফিরিয়ে যা দিয়েছে তাই থেকে মাসে এই তিরিশ টাকা। ব'সে ব'সে সাময়িক একটা ঔদাসীন্য আসে, অন্তত তখনকার জন্যে মনে হয়, দুনিয়ায় এরই জন্যে এত!

বেতন বৃদ্ধির আবেদন নিয়ে এই সভা—স্থির একটা কিছু হয়।

ক্লাশে যাই বুলাকি এসে বলে—আমার প্রাইভেট টিউটার চ'লে গেছেন, আপনি যদি পড়ান তো বেশ হয়। অঙ্কে তা হ'লে আমি নিশ্চয় পাশ করবো।

বুলাকি আগ্রহ নিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করে। রাজি হ'তে গিয়ে থেমে পড়ি। বলি—বলবো কাল। কত কি ভেবে নিষেধ ক'রে দেওয়াই ঠিক করি।

স্কুল থেকে ফিরে বাড়িতে ব'সে থাকি। সুরমা এসে বলে—কই আজকে বেরুলে না যে?

বলি—থাকনা, বরং সে-সময়টা তোমার সঙ্গে ব'সে গল্প করি। সুরমা চেয়ারের হাতলটার উপর ব'সে মাথার চুলগুলি নিয়ে খেলা করতে করতে কত কথাই না ব'লে চলে।

একটু যেন বেশি আদর করি। কে জানে সুরমা টের পায় কিনা। কথায় কথায় ব'লে ফেলি—বিশ টাকা মাইনেতে একটা 'ট্যুশনি' পাই, নিষেধ ক'রে দেবো ঠিক করেছি।

সুরমা আশ্চর্য হয়ে মুখের দিকে তাকায়। ঠাট্টার সুরে বলি—সুন্দরী মেয়ে—কি জানি, বলাতো যায় না।

শুনে কি একটু ভেবে নিয়ে মুখ ভার ক'রে সুরমা জবাব দেয়—বেশতো তাই যদি হয়, থাকবে সুখে, আমি তাতে বাদ সাধতে যাবো কেন?

চিবুক ধ'রে আদর ক'রে বলি—তাইতো ভাবি, শুরুতেই এই!

মাথাটা কাঁধের উপর এলিয়ে দিয়ে উত্তর করে—তা—বুঝি, এমন দেবতার মতো মানুষ দিয়ে কারুর বুঝি ভয় হয় আবার! বলি—দেব চরিত্রের ইতিহাসে এমন ধারা দুর্ঘটনার নজির স্বল্প নয় সুরমা!—সুরমা ও নিজকে এক সঙ্গে ভরসা দিতেই যেন বলি—বুলাকিরা খুবই বড়লোক, আমার তরফ থেকে এ অসীম সাহস, ওর তরফ থেকে এ আজগুবি শখ, দুইই অসম্ভব।

শেষ পর্যন্ত মত দু'জনেরই হয়।

সন্ধ্যায় বুলাকিদের বাড়ি যাই। সাগ্রহে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যায় ড্রইংরুমে বসাতে। কী সুন্দর ক'রেই না সাজানো সেই ঘরখানা। দরজায়-জানালায় ঝুলছে সব হালকা কাপড়ের দামি দামি পরদা। সাধারণ বাঙালী ঘরের পরদার মতো আবর্জনার আবরণ তারা নয়, তাদের কাজ শুধু সুন্দরকে অতি সুন্দর করা। বুলাকি বলে—বসুন এখানে। চা খেয়ে তারপর পড়ার ঘরে যাবেন।

সমস্ত মেঝেটা চকচক্ করছে আয়নার মতো, চলতে গিয়ে পা পিছ্‌লে যায়। বুলাকি চট ক'রে একটা হাত ধ'রে ফেলে, অন্য হাতের ধাক্কা লেগে সেণ্টার-টেবিল থেকে পেতলের ফুলদানীটা সশব্দে প'ড়ে গিয়ে গড়াতে থাকে। বড়ই অপদস্থ হয়ে পড়ি। লজ্জিত হয়ে হাত বাড়িয়ে তুলতে যাই। বুলাকি ব'লে ওঠে—বাঃ রে, আপনি কেন তুলবেন, আমি তুলছি, আপনি বসুন।

একটা কৌচের উপর ব'সে পড়ি। বুলাকি আমার দিকে চেয়ে ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে তুলতে চেষ্টা করে। বলে—মাও সেদিন এমনি প'ড়ে গিয়েছিলো। বাবা বলেন, কার্পেট পেতে দেবো। আমার কিন্তু কার্পেট মোটেই পছন্দ হয় না। এক-একটা যেন ধুলোখেকো রাক্ষস।

মুখে হাসি টেনে বলি—না বুলাকি এ ঘরে আর আমি আসবো না। কখন প'ড়ে গিয়ে হাত পা-ই না ভেঙে ফেলি।

বলে—না মাস্টারমশাই একটু চলতে-চলতেই অভ্যাস হয়ে যায়।

উত্তর করি—চলতে গিয়ে চলাটাই অভ্যাস হবে কি পড়াটা

অভ্যাস হবে কে জানে। হঠাৎ-বলা সত্যের মতো কথাটা নিজের কানেই বাজে, মনটা কেমন যেন খচ ক'রে ওঠে।

বুলাকি তার মা বোন সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। একদিনের পরিচয়ে নিঃসঙ্কোচে সবাই আমার কছে আসা-যাওয়া করে। মেয়েদের অভিভাবকরা আমাকে দেখে ভয় পায় না, মেয়েরা লজ্জা পায় না—অন্তরপুরুষ অপমান মানে। প্রতি সন্ধ্যায় পড়াতে যাই নির্বিকার শ্রদ্ধা ও স্নেহ অর্জন ক'রে বাড়ি ফিরে আসি।

পড়াবার সময় বুলাকির ছোট বোন ছায়া এসে পাশে দাঁড়ায়। বছর দশেক বয়েস, রংটা একটু ময়লা, মনে হয় ছায়া যেন বুলাকিরই ছায়া। গলার স্বর দু'জনেরই যেমনি সরু তেমনি মিষ্টি। বুলাকিকে অঙ্ক কষতে দিয়ে ছায়ার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিই। কত আদর করি। হঠাৎ মনে হয় ওকে উপহাস করছি; নিজের কাছেই যেন নিজে ধরা পড়ে যাই। ছেড়ে দিয়ে বলি—যাওতো ছায়া, চট্ ক'রে এক গেলাস খাবার জল নিয়ে এস তো।

অরুণ এসে বলে—নমস্কার মাস্টার মশাই। কি বুলা পড়া হ'লো?

বুলাকি হাতটাকে হওয়ার উপর ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—অরুণদাকে এখান থেকে যেতে বলুন মাস্টারমশাই, ভারি দুষ্টু ও, আমার অঙ্ক সব ভুল করিয়ে দেয়।

অরুণ বেরিয়ে যাবার মুখে উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়। নিমেষে আমি ওদের চোখের ভাষা প'ড়ে ফেলি—বুকটা কেমন ক'রে ওঠে।

বলে উঠি—কই, অঙ্কটা হলো না এখনো?

বুলাকি চট্ করে চোখ নাবিয়ে নিয়ে কি যেন বলে। প্রথমটা কানেই পৌছয় না।

জিজ্ঞেস করি—কি বললে ?—

বাড়ি ফিরে এসে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ি। ডাকি—সুরো।

সুরমা এসে জিজ্ঞেস করে—আমাকে খুঁজছিলে ?

মনটা সমস্ত বুকময় ছুটোছুটি ক'রে কেবলই বলতে থাকে—হ্যাঁ সুরো, তোমাকেই খুঁজছি।

সুরমা শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করে—কথার জবাব দাও না কেন গো, অমন চুপ ক'রে রইলে কেন ?

উত্তর করি—না, এই বলছিলাম কি মাথাটা বড্ড ধরেছে। সুরমা বলে—ভাতটা নাবিয়ে এক্ষুনি আসছি।

পড়ার ঘরে এসে বসি। বুলাকির আসতে একটু দেরি হয়। শেল্‌ফ থেকে বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকি। হঠাৎ একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ে, লেখাটা অরুণের। একবার একটু দ্বিধা আসে, পরক্ষণেই পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখি।

বাড়ি ফেরার মুখে কর্তার আপিস কামরায় ঢুকি। চিঠিখানা বুলাকির বাবার হাতে দিই। পড়া শেষ হয়। মুখের চুরুটটা নাবিয়ে রাখতে রাখতে বলেন—স্টুপিড্ কোথাকার। কদ্দিন বলেছি ওর মাকে ছোকরাকে নিষেধ ক'রে দিতে এখানে আসতে—ওসব স্মার্টনেসএর মানে আমরা বুঝি।

তিনি কি বোঝেন বুঝতে আমার বাকি থাকে না। তার অর্থ অরুণের অর্থাভাব। না হয় আর সব মিলিয়ে সে যা—বোধহয় উৎসাহই পেতো।

বুলাকির বাবা ব'লে চলেন—অনেক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আজকালকার ছোকরাদের মতো আপনি এসব পছন্দ করেন না ব'লেই তো সময় মতো জানতে পেলাম। আপনার মত শিক্ষকই তো —এই রকম আরও কত কি। বিদায় নেবার সময় অনুরোধ করি নামটা আমার গোপন রাখতে।

অরুণকে আর এ বাড়িতে দেখতে পাইনে। শুনি তার নাকি এখানে আসা বারণ হয়ে গেছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে।

অরুণ আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। কেবলই অনুরোধ করে শুধু মাত্র একটি বারের জন্যে ওদের সাক্ষাতের সুবিধে ক'রে দিতে বলে—আপনাকে বলতে সাহস পেতাম না, কিন্তু জানি আপনি আমাদের দুজনকেই অত্যন্ত স্নেহ করেন, সেই ভরসাতেই—

কথা তার অসমাপ্তি থেকে যায়, সবটুকু অনুনয় ফুটে ওঠে চোখে আর মুখে। বাছাই করা সব ভালো ভালো কথা ব'লে তাকে উপদেশ দিই। তবু অনুরোধ করে। শেষ পর্যন্ত আশা দিয়ে বলি—আচ্ছা দেখবো চেষ্টা ক'রে।

অরুণ আবার আসে। আগ্রহের সঙ্গে উত্তরের অপেক্ষা করে। তাকে বলি—বুলাকি রাজি হবে না বোধ হয়। ভাব দেখে মনে হয় ওর মন বদলে গেছে তাই সাহস পাইনি জিজ্ঞেস করতে।

ঠিক বিশ্বাশ করতে চায়না, তবু কথাটা বিষম আঘাত করে অরুণকে। মুখ চোখ দিয়ে বেদনা যেন ফেটে পড়তে চায়। কিছু না ব'লে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বুলাকি স্কুলে যায় না। শুনি তার বিয়ের কথা চলছে। পড়াতে বসি, বুলাকির মা গলা খাটো ক'রে বলেন—তিন দিন ধ'রে কিছু

খাচ্ছে না, আপনার কথা ও খুব শোনে, একটু যদি বুঝিয়ে বলেন—

বুলাকি টেবিলের উপর ঝুঁকে থাকে একটা বইকে উপলক্ষ্য ক'রে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ব'লতে কোনো কথাই খুঁজে পাইনে, আস্তে একটা হাত রাখি তার মাথার উপর। মুখ তুলে একবার তাকায়। মুখখানা বড়ই শুকনো, দুষ্টুমির ভাবটুকু আর খুঁজে পাইনে, সেখানে দেখতে পাই একটা দৃঢ়তা। দু'একটা কথা বলতে যাই, গলা ধ'রে আসে। হঠাৎ মাথাটাকে দু' হাতের মধ্যে গুঁজে বুলাকি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তার দুঃখ ও দৃঢ়তা চোখের জলে প'লে পড়ে।

কিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করি—ওর সাথে একবার দেখা করবে বুলাকি ?

মাথা নেড়ে জানায়, না। একটু পরে তেমনি মুখ গুঁজেই প্রশ্ন করে—ও নাকি কোথায় চ'লে যাচ্ছে ?

—তাই-তো শুনেছি, কিন্তু কোথায় যাবে বলতে পারিনে। মাথা না তুলেই বুলাকি ব'লে চলে—ওকে আমার হয়ে বলবেন, বাড়ির সবাই যা চেষ্টা করছে তা হবে না, আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি—পরে সব জানাবো।

—যা বলবার আছে একটা চিঠিতে লিখে দাও।

চিঠিটা পকেটে পুরে দাঁড়াই। বুলাকি একবার আমার দিকে তাকায়, কৃতজ্ঞতা যেন রূপ ধ'রে ফুটে উঠতে চায় সেখানে।

পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আবার একবার গিয়ে ঢুকি কর্তার আপিস কামরায়। কর্তা বলতে থাকেন—বুলাকির বিয়ে তো একরকম

ঠিক, বেশ একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে। তা আপনাকে আমি ছাড়ছিনে। ছায়ার জন্যেও আপনাকেই থাকতে হবে।

পকেটে হাত দিয়ে চিঠিটাকে চেপে ধরি। দৃঢ়তার সঙ্গে জানাই, বাড়িতে একটু কাজ পড়েছে, ট্যুশানি করার মতো সময় করা সম্ভব হবে না।

বুলাকির বাবা একটু দুঃখিত হন। কয়েক মাসের মাইনে জমিয়েছিলাম, টাকাটা হিসেব ক'রে দিয়ে দেন, পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়ি।

বরাবর অরুণদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হই। সমস্ত মনটা বিদ্বেষে ভ'রে ওঠে। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে চিঠিখানা দিয়ে দিই অরুণের হাতে। সে এসে আমার একটা হাত চেপে ধরে, যেন বলতে চায়—এমন লোক ক'জন হয়—এত সহানুভূতি ক'জনের ভিতর থাকে!

হাতটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে জরুরী কাজ আছে ব'লে বেরিয়ে আসি। একটা আংটি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরি।

সুরমাকে ডেকে বলি—আসছে বুধবার আমাদের বিয়ের দু'বৎসর পূর্ণ হবে, সেদিন পরবে তুমি এটা।

সুরমা আংটিটা হাতে নিয়ে পায়ের ধুলো নেয়। জিজ্ঞেস করে—আমি তোমাকে কি দেব?

হেসে জবাব দিই—যা দিচ্ছ—

পরের দিন বাকী টাকা কটা নিয়ে স্কুলে গিয়ে প্রথমেই ঢুকি হেডমিস্ট্রেস্‌-এর ঘরে। টাকা ক'টা টেবিলের উপর রেখে অনুরোধ করি—এবার প্রাইজের সময় অভিনয়-প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারে যেন সেটা ব্যয় করা হয়।

ভারিক্কি

হিসাব করিয়া দেখা গেল কমের পক্ষে ছয় শত টাকা প্রয়োজন। ফর্দ হইতে চোখ তুলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দু'জন দু'জনের দিকে তাকইলাম—টাকাটা আসে কোথা হইতে? জানি, সুখেন উত্তর আশা করে আমার কাছে; চোখের ভাব পরিবর্তন করিয়া সমস্যা মীমাংসার পথ চিন্তা করিতে লাগিলাম।

নিজের পরিবার লইয়াই বেচারা যথেষ্ট বিব্রত ছিল, অধুনা বাপ-মা-মরা বিবাহযোগ্যা ভগিনীটিকে নিয়া যেন অথই অবস্থায় পড়িয়াছে। কালোর দেশে কালো বর্ণ অচল, রেণুর ভবিষ্যৎ তার বর্ণের মতোই অন্ধকার এ-কথা মানিয়া লইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবার মতো নৈরাশ্য যখন সুখেনের মনকে পাইয়া বসিয়াছে, এমন সময় সামান্য একটু ভরসা পাইয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য। আশানুরূপ একটি পাত্র নাকি রেণুকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে; দাবির মধ্যে বিয়েখরচ বাবদ সামান্য কিছু অর্থ ও স্বল্প কয়খানা অলঙ্কার। পাত্রের তুলনায় দাবি সামান্য হইলেও সুখেনের ক্ষমতার তুলনায় পর্বত প্রমাণ। বন্ধু হিসাবে সুখেনের প্রতি মমতাবোধ ও সহানুভূতি আমাদের আছে তাকে বাস্তব রূপ দিবার মতো ক্ষমতা অনেকেরই নাই, আমার যেটুকু বা আছে তা-ও খুবই স্বল্প। সাহায্য বা ধার যেভাবেই হোক উপস্থিত টাকাটা সংগ্রহ করা যায় কোথা হইতে? বন্ধুদের মধ্যে একটি মাত্র লোক যে ইহার

দশগুণ টাকা স্বচ্ছন্দে দান পর্যন্ত করিয়া দিতে পারে, সে অবিনাশ। কিন্তু অমন একটা কাঠখোট্টা লোকের কাছে যাইতে হইবে ভাবিতেও মন আমার সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

পরিচিতের মধ্যে কিছুটা দাবি চলে এমন ধনীব্যক্তি আর একটিও খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা সুখেনকে সঙ্গে লইয়া অবিনাশের দোকানের উদ্দেশেই রওনা হইয়া পড়িলাম।

ব্যবসায়ে অবিনাশ উন্নতি করিয়াছে মানিতেই হইবে। স্বল্প মূলধন লইয়া পাঁচ বৎসরের ভিতর তিনতিনখানা বড় দোকান করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে—কাপড, কাটা-কাপড় ও মনিহারি। মনিহারি দোকানে বসে সে নিজে, দু-জনে গিয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম।

এক মুখ চাপদাড়ি লইয়া কাউণ্টারের পিছনে গম্ভীরমুখে অবিনাশ বসিয়া আছে, দুই দাঁতের চাপে একটা মোটা চুরুট। দোকানে ঢুকিতেই ফ্রেমে বাঁধান অনুরোধ নজরে পড়ে 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না'। কোনো কারণে যে অবিনাশ লজ্জা পাইতে পারে লিখিয়া না রাখিলে অবিশ্যি তার মুখ দেখিয়া ধারণা করা অসম্ভব। অনুরোধ লঙ্ঘনকারীরা কিন্তু বলে লিখিত কথাটাও মিথ্যা।

আমাদের দেখিয়া ভারি গলায় প্রশ্ন করিল, 'কি হে, কি খবর?' চুরুট মুখে থাকায় কথাগুলি জড়ান।

বলিলাম, 'এসেছি তোমার কাছে, একটা জরুরী পরামর্শের জন্যে।'

'আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে, হাতের কাজটা সেরে নিচ্ছি. আপিস কামরায় অপেক্ষা করো।'

আমাদের অভিপ্রায় জানা নাই, তবু কথা বলার পদ্ধতিতে মনে হইবে আমরা যেন চাকরির উমেদার। আপিস ঘরে ঢুকিবার সময়

বলিলাম, 'দশ মিনিট আগে কাজটা শেষ হলে দশ মিনিট আগেই এস, পাঙ্‌চুয়াল হয়ো না।'

ঘটনাটা আজও আমি সকৌতুকে স্মরণ করি : আমার বাড়ি একদিন ওর ছ'টায় আসিবার কথা ছিল, হঠাৎ বাহিরে আসিয়া দেখি বাড়ির খানিকটা দূরে অবিনাশ পায়চারি করিতেছে—ছ'টা বাজিবার তখনও নাকি সাত মিনিট বাকি ছিল।

ভাগ্য ভাল অনেকটা আগেই আজ অবিনাশ আসিল। সুখেনের হইয়া আমিই শুরু করিলাম। মনোযোগ দিয়া দেখিবার সময় অবিনাশ কান বন্ধ করে না বটে, মনোযোগপূর্বক শুনিতে বা বলিতে হইলে চোখ বন্ধ করিয়া লয়। সুখেনের পারিবারিক অবস্থার কথা নতুন করিয়া বলিবার কিছু নাই, তাই বিশেষ করিয়া অনাথা অনূঢ়া ভগিনীটিকে লইয়া উপস্থিত সে কি প্রকার বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে সে-বিষয়ে যৎকিঞ্চিত আভাস দিয়া বলিলাম, 'সম্প্রতি একটি ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, বিয়েখরচ বাবদ নগদ দেড়শ' টাকা আর সামান্য খানকয় গয়নার দাবি আছে—'

চোখ বুজা-ই আছে : অবিনাশ বলিল 'অনাথাকে বিয়ে করতে এসে যে দাবি জানায় তার হাতে মেয়ে দেওয়াইতো উচিত নয়। তা ছাড়া সুখেন টাকা পাবে কোথায় ?'

ভাল, অবিনাশও প্রশ্ন করে!

বলিাম, 'সে জন্যেইতো তোমার কাছে এসেছি।'

অবিনাশ চোখ খুলিল। বলিল, 'আমি তার কি করিতে পারি বলো, আমার হাতখরচ তো মোটে একশ'টাকা।'

'ও তো একটা কথার কথা, সব কিছুর মালিক তো তুমি-ই।'

গম্ভীর চালে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে অবিনাশ। 'সে হয় না। ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঁধা আইনের বাইরে আমি যাই নে।'

আইন অবিনাশ নিজেই বাঁধিয়াছে, ইচ্ছা করিলে সে বাঁধন ঢিলা করিতেও সে পারে। অংশীদার দূরের কথা, তার মতের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ তুলিবার মত কোনো অভিভাবকও নাই। দারিদ্র্যকে স্পষ্ট ও নগ্নভাবে চিনিবার সুযোগ যার জীবনে ঘটিয়াছে তার মধ্যে অভাবের প্রতি সহানুভূতির অভাব দেখিলে শুধু দুঃখ হয় না রাগ হয়। মনে মনে রীতিমতো অসন্তুষ্ট হইলাম: সুখেনের স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়া চাপিয়া গিয়া বলিলাম, 'তা-ই না হয় হলো, সুদে টাকা খাটানও তো তোমার একটা ব্যবসা, টাকাটা না হয় ধারই দাও।'

মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, 'ইনভেস্টমেণ্ট কোথায় করতে হবে তারও বাঁধাধরা নিয়ম আছে—বিজনেস্ ইজ বিজনেস্।'

সুখেন এ যাবৎ চুপ করিয়া ছিল। আশার কোনো আভাস না পাইয়া চোখ তার ছলছল করিয়া উঠিল। শেষ চেষ্টা হিসাবেই বোধ করি বলিয়া ফেলিল, 'আমি ভাই কোনো কিছু জানতেও চাইনে বুঝতেও চাইনে; রেণুকে তোমার কাছে এনে সব ভার তোমার হাতে তুলে দেবো, দেখি কেমন কিছু না ক'রে থাকতে পারো।'

'না, কোনো ভার নেবার মধ্যে আমি নেই, এর-ওর ভার নিয়ে নিয়ে হয়রান হ'য়ে উঠেছি।'

তিক্তভাবে কথা কয়টা বলিয়া অবিনাশ চুপ করিল। ইহার পর কোনো অনুরোধের কথা উচ্চারণ করিতেও মুখে বাধে। কিছুক্ষণ তিন জনেই চুপচাপ। অবিনাশ চেয়ার ছাড়িয়া হাত পাঁচেক জায়গার মধ্যে পাইচারি করিতে লাগিল। হঠাৎ থামিয়া মুখের চুরুটটাকে

ঠোঁটের সাহায্যে কোণস্থ করিয়া শক্তভাবে দাঁতে চাপিয়া ধরিল। 'রেসপনসিবিলিটি একটা না একটা ঘাড়ের ওপর এসে পড়বেই।' আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'এই দেখ না, অবনীবাবুর মেয়ের বিয়েতে অত সব ঝানু বুড়োর সামনে পনেরো হাজার টাকা খরচের ভার স্রেফ্ ছেড়ে দিলে কি না আমার মত এক ইয়ংম্যানের হাতে—ক'দিন কি খাটুনিটাই না গেছে।'

নালিশ ও তাক্তার মধ্যে কেমন একটা গর্বের ভাব মিশানো ছিল।

বলিলাম, 'করিতকর্মা লোকের হাতেই লোকে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, আমরাও দেখ না সব ছেড়ে তোমার কাছেই ছুটে এসেছি।'

'তুমি ছাড়া আর আছেই বা কে, কার কাছে যাব বলো।' সুখেনের কণ্ঠ করুণ।

অবিনাশ চেয়ার টানিয়া বসিল। 'কিন্তু এ-ভার আমি কি ক'রে নিই, ভার আর ভার, আমি ছাড়া আর যেন লোক নেই—' কিছুক্ষণ দম ধরিয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিল 'নিজের জমা টাকা থেকে টেনেমেনে বড়জোর একশ' টাকা সাহায্য আমি করতে পারি, কিন্তু বাকিটা—'

বলিয়া পুনরায় অবিনাশ চোখ বুজিল। এবার প্রশ্নটা নিজেকে করিয়াছে বলিয়াই মনে হইল, তাই উত্তরের অপেক্ষায় আমি ও সুখেন চুপ করিয়া রহিলাম।

অবিনাশ চিন্তা করিয়া চোখ মেলিল। আপন মনেই বলিতে লাগিল, 'যত সব ইয়ে—নিজের কাজের অন্ত নেই তার ওপর—' আমার চোখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'টাকাটা ধার আমি দিতে পারি যদি তুমি সিকিওরিটি দাঁড়াও, ইন্‌টারেস্ট মিনিমম টুয়েনটিফোর পার্সেন্ট

—বিজনেস্ ইজ বিজনেস্। যদিও গোল্ড সিকিওরিটি ছাড়া ইনভেস্ট আমরা করিনে।'

অবিনাশ থামিল। এমনিতেও অস্বীকার আমি করিতাম না, বিশেষ করিয়া অন্তকে অনুরোধ করিতে আসিয়া নিজে পিছাইলে চলিবে কেন।

বলিলাম, 'বেশ তাই হবে। তবে এটা না ব'লে পারলাম না যে, তুমি পাকা একটি ছোটলোক হয়েছ।'

কথা শুনিয়া অবিনাশ বিজ্ঞের মতো শুধু একটু হাসিল।

আমরা সাগ্রহে আগাইয়া দিলাম, অবিনাশ দু-চারবার আপত্তি জানাইয়া সামান্য কাজের সবটুকু ভার গছিয়া লইল। পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হইতে শুরু করিয়া পুরুত ঠিক করা, মায় বিয়ের জিনিষপত্র কেনাকাটির ব্যবস্থা করিয়া মঙ্গলমতো বিয়েটি করাইয়া দিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অবিনাশ গ্রহণ করিল। অবশ্য টাকার অঙ্কটা ছ'শর উর্ধ্বে নয় একথা বার বার পরিষ্কার করিয়া বলিয়া লইতে ভুল সে করিল না।

আমি ও সুখেন দুজনে মিলিয়া পাঁচশ' টাকার এক হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলাম। অবিনাশ লম্বা চেক বইখানা ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া সযত্নে টেবিলের উপর রাখিল। মলাট পাল্টাইয়া প্রথম পাতাটাকে টান করিবার ছলে বার তিন সযত্নে হাত বুলাইয়া লইল। ছেলেপুলেদের মধ্যে অনেকে আছে খাদ্যবস্তু না খাইয়া হাতে করিয়া রাখিতে ভালবাসে: তাদের চোখের দৃষ্টি ও হাতের যত্ন লইয়া অবিনাশ চেকবইখানি নাড়াচাড়া করে।

লেখা হইয়া গেলে বলিলাম, 'তোমার ঐ একশো টাকাও এই সঙ্গে লিখে দিলেই তো পারতে।'

দাড়ির ফাঁকে দেখা দিল সেই ক্ষীণ হাসি। বলিল, 'সেন্স অব বিজনেস তোমার একেবারে নেই। নিজের টাকা এখানে কোথায়; এ টাকায় ওভাবে হাত দেওয়া মানে তো তহবিল তসরুফ।'

এদের বিচারবুদ্ধিই আলাদা। প্রতিপদে এরা নিয়মকানুনের চাকর। নিজের টাকা নিজে দিবে তার আবার এখান আর ওখান কি! যদিই বা হয়, সময় মত পূরণ করিয়া রাখিলেই হইল।

স্থখেন বলিল, 'ও টাকা আর আমাদের দেবে কি বরং এটাও তোমার কাছেই রেখে যাই, খরচপত্তর তো সব তোমার হাত দিয়েই হবে।'

কথাটা মিথ্যা নয়। চেকটা অবিনাশের নিকট রাখিয়া দুজনে চলিয়া আসিলাম।

বিয়ের দিন দুই আগে অবিনাশের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল আমার দরজায়। ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ার টানিয়া অবিনাশ বসিল। চুরুটটা মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে টিপিয়া মুখ হইতে নামাইল, মুখ গম্ভীরতর করিয়া বলিল, 'দরজাটা ভেজিয়ে দাও।'

আমার এক গায়ক বন্ধু আছে, গান গাইবার সময় তার স্মিত মুখ থমথমে হইলেই বুঝিতে পারি এখন সে গিটকিরি ছাড়িবে: অবিনাশের মুখের গাম্ভীর্য ও যখন উৎকট হইয়া ওঠে, বেশ বুঝি হয় সে কাজের কথা বলিবে, নয় তো উপদেশ দিবে। জানা থাকা সত্ত্বেও আজ মনটা শঙ্কিত হইল। কথামত দরজা ভেজাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ব্যাপার কি বলো দেখি?'

'কাজকর্ম, জিনিসপত্তর, টাকা পয়সা, কোনটার কি ফর্দ করেছি তোমাকে দেখাতে এলাম।' বলিয়া কতক কাগজ বাহির করিয়া সে টেবিলের উপর রাখিল।

বাঁচা গেল, কোন দুঃসংবাদ নয়। বিয়ের ফর্দ দেখাইতে দরজা দিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তা অবিনাশের শ্রেণীর লোক ছাড়া বোধগম্য হওয়া কঠিন। কাজে, কথায় ও চালচলনে গাম্ভীর্যের ত্রুটি না ঘটে এটাই যেন জীবনে প্রধান লক্ষ্য। ফর্দগুলি দেখিয়া কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার জো থাকে না যে শৃঙ্খলা রাখিয়া কাজ করিবার পদ্ধতি লোকটির সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। এ জাতীয় লোকের হাতে কাজের ভার দিবার পর অক্ষমতার ভয় থাকিতে পারে, অবহেলার ভাবনা থাকে না।

বিয়ের দিন দোকানের কতক কর্মচারী লইয়া অবিনাশ বিয়েবাড়ি রীতিমতো জাঁকাইয়া বসিল। হৈ-চৈ হাঁক-ডাক কোনো কিছুরই অভাব রহিল না। অবিনাশ দাঁতে চুরুট চাপিয়া এখানে তদবির করিয়া বেড়াইতে লাগিল—এক কথায় আয়োজন সামান্য হইলেও সর্বাঙ্গীন।

আমার উপর ভার ছিল বরযাত্রীদের আদরআপ্যায়ন করিবার, আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। লগ্ন যতই সন্নিকট হইল বরকর্তাদের মধ্যে চঞ্চলতাও বাড়িতে লাগিল দেখিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইলাম। একটু খোঁজ নিতেই জানা গেল, মুখ ভার করিয়া অত ফিসফাস কথা-বার্তার মূলে, তারা আরও কিঞ্চিৎ নগদ অর্থ চায়। এ বিয়ের পিছনে মস্ত একজন ধনীলোক আছে একথা আগে জানিলে এত অল্পে কালো মেয়ে ঘরে তুলিতে কিছুতেই নাকি রাজি হইত না।

বরকর্তার সঙ্গে পাকাকথা অবিনাশই বলিয়াছে, তাকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিলাম। কিসের দাম দিবার জন্য মনিব্যাগে হাত ঢুকাইয়াছিল, ধীরে ধীরে খালি হাতটা টানিয়া বাহির করিল। শার্টের

একপাশ তুলিয়া পেটফোলা মনিব্যাগটা ঢুকাইয়া দিল ফতুয়ার পকেটে, তারপর কোনো কথা না বলিয়া চলিতে শুরু করিল।

অবিনাশ গিয়া কিন্তু আপসের পথে একেবারে এক পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া বসিল। কোনো বাকবিতণ্ডার প্রশ্রয় না দিয়া বরকর্তাকে বলিল, 'গরিবকে বিপদে ফেলে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করতে চান আপনি—আপনি ছোটলোক, এ মুহূর্তে আমার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান।'

ইহার পর গেল বিতিকিচ্ছে রকমের একটা কাণ্ড বাধিয়া। কথা শুনিয়া বরপক্ষের দু-চার জন রুখিয়া উঠিল। কর্তার উপর হুমকি দিতে দেখিয়া ,অবিনাশের কর্মচারিবৃন্দ যে-মূর্তি ধারণ করিল তার সামনে বীরত্ব প্রকাশটা সুফলপ্রসূ হইবে না বুঝিতে পারিয়া বরপক্ষীয়রা বরসহ সরিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিল। নিজেদেব মধ্যে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অনেক কথা বলাবলি করিতে করিতে তারা বাহির হইয়া গেল। কথাবার্তা হইতে বুঝা গেল ইহার একটা প্রতিশোধ না লইয়া তারা ক্ষান্ত হইবে না।

এক ছোকরা যাইবার মুখে অবিনাশকে সাবধান হইয়া চলিবার উপদেশ দিয়া গেল। জানান না দিয়া কিছু করাটা বীরধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়া, না, ভবিষ্যতে নিজের অক্ষমতার দায়টা অবিনাশের সাবধানতার ঘাড়ে চাপাইবার সুবিধার জন্য ঠিক বুঝা গেল না।

এ সকল অবস্থায় বাড়ির মেয়েরা যা করিয়া থাকে তা-ই করিতে লাগিল।

'এ কি সর্বনাশ করলে অবিনাশ—', কান্না চাপিবার চেষ্টায়ই বোধ হয় সুখেন থামিল।

অবিনাশের অর্বাচীনের মতো এই রূঢ় ব্যবহার দেখিয়া কিছু বলিব মনে করিয়াছি এমন সময় সুখেনকে সে বলিল, 'ভার যখন আমার ওপর ভাবনাও আমার, এখন কোনো কথা বলতে এস না।'

খসখস করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া অবিনাশ তার ড্রাইভারের হাতে কোথায় যেন পাঠাইল। কি উদ্দেশ্য চিঠির, কাহার নিকট পাঠাইল, কিছুই বুঝা গেল না। অবিনাশের মুখের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবার মতো ভরসাও পাইলাম না, থমথমে আবহাওয়ায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পত্রবাহকের সঙ্গে একটি যুবক আসিয়া হাজির। যুবকটিকে লইয়া কিছুটা তফাতে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়া অবিনাশ আমাকে ডাকিল। বলিল, 'এর নাম নরেন। আমাদের স্বজাতি, ভালো ঘর। আই-এ পর্যন্ত পড়েছে, আমার এ্যাসিস্টাণ্ট, আমার কথা ও ফেলবে না কিছুতেই।' নরেনকে বলিল, 'ত্রিশ টাকা পাচ্ছ, সামনের মাস থেকে পঞ্চাশ পাবে, আমি থাকতে সংসার চালাবার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।—এক্ষুণি বিয়ে করতে হবে—মেয়ের বাপ-মা নেই, রঙ কালো, বুঝলে।'

নরেন ঠিক বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। প্রথমটায় কেমন থতমত খাইয়া গেল। একটু সামলাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'বাবা নেই, মা'র একমাত্র সন্তান আমি, আমার বিয়ে তাঁর মস্ত শখের ব্যাপার—তা ছাড়া এমন একটা কারণ আছে—অবশ্যি আপনাকে বলতে বাধে—'

নরেন থামিল। মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্পষ্ট মত প্রকাশ করাও

কঠিন বটে। আপত্তির বড় কারণ মেয়ের বর্ণ না অন্য কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

তেমনি ছাড়া ছাড়া ভাবে নরেন বলিয়া চলিল, 'আপনি আদেশ করলে 'না' বলা অবিশ্যি আমার পক্ষে—আপনার ওপরই সব ভার ছেড়ে দিচ্ছি—'

আবার সেই ভার ছাড়িয়া দেওয়া : অবিনাশের মুখ ম্লান হইয়া আসে, আস্তে আস্তে বলে 'আচ্ছা তুমি যাও।'

অবিনাশের চোখমুখ দেখিয়া মনে হইল সে যেন ভয় পাইয়াছে। তার বিবর্ণ চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া আমিও ভয় পাইলাম। আমরা কি স্থির করি জানিবার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত অবস্থায় অপেক্ষা করিয়া আছে। অবিনাশ চলিতে শুরু করিল : কি বলিব কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে শুরু করিলাম।

সুখেনের কাছে আসিয়া অবিনাশ দাঁড়াইল : মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে কোনো আপত্তি আছে ?

অকস্মাৎ এমন একটা কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া যায়। সুখেন শুধু বোকার মতো হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে অবিনাশের মুখের দিকে। এই দাড়িওয়ালা নীরস লোকটির হাতে মেয়ে দিবার জন্য অনেক আধুনিক মেয়ের বড়লোক বাপ যে দু'বেলা হাঁটাহাঁটি করে এ কথা জানিতে কারুর বাকি নাই।

বাড়িময় একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, মেয়েটার ভাগ্য বটে।

কাজ শেষে বিয়ের পিঁড়ি হইতে নামিয়া অবিনাশ আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। বেশ অনুভব করিলাম তার সর্বশরীর কাঁপিতেছে। আমার

একটা হাত মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ‘সংস্কৃত মন্ত্রগুলোর অর্থ লক্ষ্য করেছ ?’

বিয়ের মন্তরে কে কবে অর্থ খুঁজিতে বসে, তা ছাড়া দেব ভাষার ’পরে দখলও খুবই কম, বলিলাম, ‘না—কেন ?’

‘উঃ কত বড়ো রেস্‌পন্‌সিবিলিটি—’

জীবনের প্রতি কি উৎকট দৃষ্টিভঙ্গি। হুস্‌ করিয়া শ্বাস ফেলার শব্দ হইল। দীর্ঘশ্বাস নিশ্চয়ই—অন্য সময় হইলে বিশ্বাস করিতাম না, ভাবিতাম হাই তুলিয়াছে।

বিয়ের মন্ত্রের বড় বড় প্রতিজ্ঞা যখন অবিনাশের দায়িত্ববোধে কাঁপুনি ধরাইয়া দিয়াছে, আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। বিয়ে-খরচ বাবদ দেয় নগদ টাকাটা বাঁচিয়া গেল—তুচ্ছ কথা নয়। যদিও আজকে অবিনাশ এখন বর, তবু জানি, হ্যাণ্ডনোটের টাকাটা আমাদের পরিশোধ করিতে হইবে—বিজনেস ইজ বিজনেস।

মনিব্যাগ

বাংলার এক বিখ্যাত রঙ্গালয়ে বাংলার মেয়েদের সম্পর্কে বেশ উপদেশাত্মক একটি নাটকাভিনয় চলছে। অনিমেষ তার বৌদি ও এক বান্ধবীকে নিয়ে গেলো সেই অভিনয় দেখতে। অনিমেষ থিয়েটার বড়ো একটা দেখে না। সে সিনেমা দেখিয়ে ছেলে, জ্ঞান দুরবীণ ক'ষে চলচ্চিত্রাকাশের প্রত্যেকটি তারক-তারকার হাব-ভাব ও গতি-বিধি নিখুঁতভাবে পাঠ ক'রে নিয়েছে। আধুনিক 'ড্রইংরুম টকে' তাই বিশেষ একটা স্থান আছে তার—বিশেষ ক'রে আর্টের আলোচনায় তো অখণ্ড অধিকার।

অনিমেষ নিজে বসে মাঝখানে, একপাশে তার বৌদি, অপর পাশে ব্যারিস্টার কন্যা ডলি। অভিনেতাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি কোথাও আর্টের চমক খেলে যায় সেটা জানা এবং জানানোর ভার অনিমেষের উপর। অভিনয় সুরু হবে—ঠিক এমনি সময় সামনের 'রো'তে যে তিনখানা সিট কোল পেতে অপেক্ষা করছিলো,—এসে জুড়ে বসলেন তিনটি তরুণী। মাথায় ও কপালে তাদের নিষেধের নিশানা নেই—অনিমেষের উৎসাহ বেড়ে গেলো। সঙ্গে যদিও একটি বান্ধবী রয়েছে, হলে কি হবে, বান্ধবীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলার আগ্রহ তার অসীম। এ বিষয়ে সে একেশ্বরবাদী—একেশ্বরীবাদে শ্রদ্ধা তার নেই। অনিমেষের দুঃখ হয় এই ভেবে; মেয়ে তিনটি সামনে না ব'সে যে-কোনো পাশে এসে বসলে সুবিধা হতো ঢের বেশী। তার দু' পাশে

ছুটি সূত্র রয়েছে, তারই একটির উপর দিয়ে সার্কাসীয়ানের পটুতা ও সতর্কতা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে অনায়াসে আলাপ জমিয়ে বসতে পারতো। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে অনিমেষ অভিনবের দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে।

অভিনয়ের শুরু থেকে শুরু হয় সব মোটা রকমের দুঃখের কথা। দুঃখটাকে গাঢ়তর করার জন্যে লেখক মাঝে-মাঝে এক-একজনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। মেয়েদের দৃষ্টি চোখের জলে কেবলই ঝাপসা হয়ে আসে। অনিমেষের বৌদি ভুলে তাঁর রুমাল ফেলে এসেছেন—চেয়ে নেন অনিমেষের কাছ থেকে। অনিমেষের কাছে কিন্তু অভিনয়ের দুঃখের বহরটা মোটেই ভালো লাগে না—তা হলেও দুঃখিতাদের সে কিছু বলতেও পারে না! বিশেষ তর্ক ক'রে বিরুদ্ধ মত বহাল রাখার সময় ক'রে নেওয়া সেখানে সম্ভব নয়।

স্বল্প-পরিসর রাস্তা তাতে আবার নিজের 'রো'তে জোড়ায়-জোড়ায় সব নীরস হাঁটু—এদের বাঁচিয়ে ঘন-ঘন বাইরে যাবার তাগিদ অনিমেষের নেই। তৃতীয় অঙ্কের শেষে ড্রপ পড়বার পরে সিটে ব'সেই সে পানওলার কাছ থেকে একটা পান কিনে মুখে পুরে দিলো। হাত মুছবার জন্যে বৌদির কাছ থেকে রুমালটা হাতে নিয়েই কি যেন বলতে যাবে এমন সময় ডলি ব'লে উঠলো—উঃ, কি চমৎকারই না হচ্ছে। সত্যি মনটা ভারি খারাপ লাগছে ঝণ্টুটাকে রেখে এসেছি ব'লে। আচ্ছা, আপনার ভালো লাগছে না অনিমেষবাবু?

অনিমেষ মুখে কিছু না বলে, এইমাত্র বৌদির হাত থেকে নেওয়া সেই রুমালটা বাড়িয়ে ধরলো ডলির কোলের কাছে। ডলি সেটা হাত দিয়ে একবার দেখে নিয়ে তার ছোট্ট রুমালখানা অনিমেষের

হাতের কাছে ধ'রে বললো—আর দেখুন এটার অবস্থা। অনিমেষ বললো—আমারটা নেহাৎই বড়ো, না হয় দুঃখটা আমারও কিছু কম হয় নি।

অনিমেষ কথা বলে বটে কিন্তু মন ও চোখ থাকে তার সামনের দিকে। ঠিক তার সামনের সিটে যে-মেয়েটি বসেছে, মাঝে মাঝে সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। অনিমেষের সঙ্গে দু-একবার চোখাচোখিও হলো। অনিমেষের মনে হয় মেয়েটি যেন তার পরিচিত। অবশ্য এ মনে হওয়ার কোনো অর্থ নেই, এমনি ধারা মনে তার সব সময়ই হয়। বিশের কোঠায় যে-কোনো মেয়ের মুখই তার বিশেষ পরিচিত ব'লে মনে হয়। সবাই যেন বড়ো আপনার, শুধু বহুদিনের অসাক্ষাৎ ও বহু রকম জুলুম মাঝখানে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছে মাত্র।

ডলি অন্য কোনো মেয়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখলে বড়ো অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুই লক্ষ্য করেনি এমন ভাব নিয়ে সে প্রোগ্রামের পাতা উল্টাতে লেগে যায়। বৌদি নারীসুলভ পরিহাসছলে অনিমেষের গায়ে একটা চিমটি কাটতে অনিমেষ এমন একটা মুখের ভাব করে, যেন এ রকম অত্যাচার তাকে কত সইতে হয় সে-ই জানে, কিন্তু কিছুটা অত্যাচার আশা (আশঙ্কা নয়) করার মতো যে তার চেহারা তাতে সন্দেহ নেই।

ড্রপ উঠতেই বাইরের বাতি নিভে যায়। আবছায়া অন্ধকারে সেখানে দৃষ্টি হয়ে পড়ে অকর্মণ্য, অনিমেষ অস্বস্তি বোধ করে। অভিনয় দেখার চাইতে নভেলী ঢংএ একটা অভিনয় করার জন্য মন তার নিস্-পিস্ করতে থাকে। সে যখন ভেবে পাচ্ছিলো না কি করে আর একটু এগোনো যায়, এমন সময় টের পায় টপ করে কি যেন একটা পড়লো

তার পায়ের কাছে। হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রেই বুঝতে পারলো বস্তুটা তুচ্ছ করার মতো নয়। চট্ ক'রে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে একটু পরেই সে বাইরে বেরিয়ে গেল। আলোর কাছে নিয়ে দেখলো বস্তুটা থলের মতো মরক্কো চামড়ার তৈরী ছোট্ট একটি মনিব্যাগ, মুখ তার ফাস্‌নার দিয়ে আঁটা। মাঝখানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—জোনাকী সেন, ৫২ বি হিন্দুস্থান রোড'। অনিমেষের মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—এ যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, সাগ্রহ আমন্ত্রণ।

ফাস্‌নারের দাঁতকপাটি ছাড়িয়ে স-সন্তর্পণে মুখ খুলে দেখে, ভেতরে রয়েছে পাঁচটি টাকা, আর জ্ঞান জগতের চিরশিশুদের ছোট্ট একটি শিশু রুমাল। রংটা তার গোলাপী, এক-কোনে লেখা 'শনিবার'। বারের নাম প'ড়ে অনিমেষের মনটা খট্ ক'রে ওঠে। অমনি আবার ভাবে, আজ শনিবার, সেটা থেকে শনিবারের সাজ সঙ্গে আসবে তাতে আর ভাবনার কি আছে। অতিরিক্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা মনকে কতটা কুসংস্কারাপন্ন ক'রে তোলে ভেবে তার হাসি পেলো।

মেয়েটির বর্ণ যদিও ও খুব উজ্জ্বল নয়—মুখখানা ভারি সুন্দর। অনিমেষের চোখে সব চাইতে ভালো লাগে ওর চোখ দুটি; চেহারার সৌন্দর্যের চেয়ে পরিচয়ের অভিনবত্বের উপরেই অনিমেষের মোহটা বেশি। তা ছাড়া প্রতিদান ব'লে একটা কথা তো রয়েছেই। এমন সহজ সুন্দর ভাবে বাড়ির রাস্তা ও পরিচয়ের রাস্তা দুটোই নির্দেশ ক'রে দেওয়াতে অনিমেষ মনে মনে মেয়েটির বুদ্ধির তারিফ না ক'রে পারে না। মুহূর্তে তার চিন্তাধারা ঘটনার অলি গলি বেয়ে বহুদূর এগিয়ে যায়—অপরিচিতার সঙ্গে যেন নিবিড়ভাবে তার পরিচয় হয়ে গেছে। প্রথম পরিচয়ের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে আলাপ হয়।

পিছন দিকে তাকিয়ে অনিমেষকে দেখা মাত্রই যে খুব ভালো লেগেছিলো—এ পর্যন্ত মেয়েটি সলজ্জভাবে স্বীকার করে, কিন্তু থলেটা যে ইচ্ছে ক'রেই ফেলেছিলো এ কথা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। অনিমেষ রাগ করে। এ সত্য কথাটা বললে সে যদি একটু আনন্দ পায় তো তাতে এত কৃপণতা কেন। মেয়েদের এই নিরর্থক লজ্জার কোনো মানে খুঁজে না পেয়ে মনে মনে সে ভারি চ'টে যায়।

কল্পনায় বাধা পড়ে। হঠাৎ তার মনে হয় এও তো হতে পারে—এটা অজান্তে প'ড়ে গেছে, হয়ত একটু পরেই খোঁজ পড়বে। আবার ভাবে, মঞ্চে যে আন্দাজ মড়ক লেগেছে, অনিচ্ছাকৃত হ'লে রুমালের তাগিদে অন্তত একবার খোঁজ পড়তো। পড়লেও আজ যে ফেরত দেবে না সে-বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে তার নিজের সিটে ফিরে গেল।

মহিলা তিনটির পাশে যে কয়টি যুবক বসেছে, চাপা হাসির সঙ্গে তাদের ফিসফাস কথাবার্তা থেকে অনিমেষ ভেবে নিলো নিশ্চয়ই তারা তার প্রতি মেয়েটির চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রেই এসব করছে। সে একটু যে অস্বস্তি বোধ না করলো তা নয়, কিন্তু গৌরব বোধ করলো তার চেয়ে ঢের বেশি। শেষাঙ্ক শেষের দিকে গড়িয়ে গেল। অনিমেষের বাঞ্ছিত দৃষ্টি আর একবার বোধহয় পিছন ফিরে তাকে দেখে নিলো; কিন্তু তার হেফাজতে যে অমূল্য বস্তুটি রয়েছে তার তালাশ পড়বার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

বাড়ির গাড়ি অপেক্ষা করছে, অভিনয় শেষে মহিলা তিনটি উঠে বসেন। অনিমেষ কোনো প্রকারে এরই মধ্যে বিদায়-দৃষ্টি-বিনিময়টা সেরে নিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে নিজের 'বেবি'তে চেপে রওনা হ'য়ে পড়ে।

জাতিগত অস্তিত্বের মূল্য হিসেবে ডলি পুরুষদের এসব দুর্বলতাকে

সম্নেহে ভ্যানিটি কেসে রেখে দেবার মতো ব'লেই মনে করে। কিন্তু বারবার নিজের অস্তিত্বে ঘা পড়ায় সে বেশ একটু কষ্ট হয়েছে। সেটা প্রকাশ ক'রে অনিমেষকে অধিক তুষ্ট হবার সুযোগ দিতে সে রাজি নয়, তাই যথাসম্ভব সহজ ভাব বজায় রেখে গাড়িতে ব'সে কথাবার্তা বলতে থাকে। তার বাড়ির দোর গোড়ায় এসে যখন গাড়ী থামলো, নেমে শুধু ছোট্ট একটি নমস্কার ও ধন্যবাদ জানিয়ে সে ভেতরে চ'লে গেল।

বাড়ি ফিরে অনিমেষ সটান গিয়ে নিজের কামরায় ঢুকে পড়লো। একটা আরাম কেদারায় ব'সে প্রাপ্ত বস্তুটিকে সস্নেহে নাড়াচাড়া করতে করতে সে নাম ও ঠিকানাটা আরও বার কয়েক প'ড়ে নিলো। তার কল্পনায় ঘটনাবলী মধুর হতে মধুরতর হয়ে ফুটে উঠতে লাগলো।

বাতি নিভিয়ে দিতেই চাঁদ যেন বজ্জাতি ক'রে জানালা দিয়ে এক ঝলক জ্যোৎস্না অনিমেষের নাকে মুখে ছিটিয়ে দিলো। ঘুম তার এমনিতেও আসবে না—অনিমেষ ছাদে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়ে। কই মাছ যেমন মেঘের ডাকে এঁদো ডোবা ছেড়ে প্রাণের আবেগে নাচতে নাচতে ডাঙ্গায় উঠে আসে—অনিমেষও তেমনি শহুরে চাঁদের হাতছানি পেয়ে ঘর ছেড়ে ছাদে গিয়ে আবেগের বেগে পায়চারি করতে শুরু করে। হঠাৎ তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি আসে। ঠিক ক'রে ফেলে কোনো একটা উপহার সে সঙ্গে রাখবে এবং সম্ভব হলে সুযোগ বুঝে মণিব্যাগটার মধ্যে পুরেই সেটা ব্যক্তিবিশেষের কাছে পৌঁছে দেবে।

কিন্তু কি দেওয়া যায় তাই নিয়ে পড়ে সে মহা ভাবনায়। বস্তুটা বেশ অর্থপূর্ণ হবে এমন কিছু দেওয়া চাই। অনেক গবেষণার পর

একটা পার্কার কলম দেওয়াই স্থির করে। অর্থটি হবে চমৎকার—অথচ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লিখে দেবে 'parker from a parker'। কবিরা আবহমান কাল থেকে জীবন-তরী ঘাটে ভিড়িয়ে আসছেন, অনিমেষ সেটাকে জীবন-গাড়ি রূপে ঘাঁটিতে দাঁড় করিয়ে দেবে।—নিজের কল্পনা শক্তির উপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

উপহার দেওয়া সে স্থির করে বটে, সঙ্গে সঙ্গে একটা দ্বিধা তার মনে উঁকি দিতে থাকে। শুরুতেই অপর পক্ষ ব্যাপারটা এত স্পষ্টভাবে মেনে নিতে চাইবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আসে। শেষ পর্যন্ত মনকে প্রবোধ দেয় এই ব'লে, প্রথম পরিচয়ে নেহাৎ অসম্ভব হলে দু'দিন না হয় অপেক্ষাই করবে।

অনিমেষকে ছাদে টেনে নিয়ে চাঁদ আস্তে আস্তে পালিয়ে যায়। বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেবার জন্যে অনিমেষ তার ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

চাঁদের ধারকরা আবছা আলো মনের ভিতর যে সব মায়ালোক গ'ড়ে তুলেছিলো, দিনের নিষ্ঠুর আলো তার সকল ফাঁকি ধরিয়ে দিলো। অনিমেষের মনে প্রতিকূল অবস্থার চিত্রগুলি ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে লাগলো। হয়তো মেয়েটির সঙ্গে দেখাই হবে না, হয়তো অনিচ্ছা সত্বেও ছেলেদের কারুর হাতেই ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে হবে। এ সকল ভাবনার ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে তার উপহার দেবার বাসনাটুকু যেন উবে যায়।

দিনের আলোটা বড়ো খট্‌খটে ও কর্কশ, অনিমেষ তাই সন্ধ্যায় যাওয়াই স্থির করে। সমস্তটা দিন ছট্‌ফট্ ক'রে সন্ধ্যায় সেজেগুজে

ছোট্ট গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নির্দিষ্ট বাড়ির খোঁজে। কিছুক্ষণ পরে সত্যি সত্যি সে এসে হিন্দুস্থান রোডের ৩২ বি'র সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। ছোট রকমের একখানা একতলা বাড়ি। গত রাত্রের নারীদের সঙ্গে বাড়িটা যেন খাপ খেতে চায় না। অনিমেষের মনটা কেমন একটু দমে গেল। গত রাত্রে সঙ্গে তাদের বাড়ির গাড়ি ছিলো। কিন্তু এ বাড়িতে সে গাড়ির আস্তানা খুঁজে পেলো না। এ সকল অসামঞ্জস্যের জবাব পেতেও আবার দেরি হয় না, ভাবে, কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর গাড়ি হওয়া অসম্ভব নয়, আর শাড়ি দেখে বাড়ির অবস্থা আঁচ করাও আজকালকার দিনে সুকঠিন।

সামনের ঘরে তিন চারটি যুবক ব'সে গল্প করছে, দরজায় গাড়ি দাঁড়াতে দেখে তারা উন্মুখ হয়ে তাকালো। অনিমেষ ভিতরে ঢুকে অনুরুদ্ধ হয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলো। একটি যুবক প্রশ্ন করলো—কা'কে চান আপনি?

সবারই মুখের ভাব যেন কেমন—অনিমেষ অস্বস্তি বোধ করে। এঁদের মাঝে ব'সে তেমন কোনো সুবিধা হবে বলেও তার ভরসা হয় না। ভাববার সময় নেই, তাড়াতাড়ি প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার, বললো—আজ্ঞে—কিছু যদি মনে না করেন—এ বাড়িতে জোনাকী সেন বলে কেউ থাকেন!

সেই যুবকই উত্তর করলো—হ্যাঁ, গত রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়ে তার একটা মনিব্যাগ হারিয়ে গেছে। আপনি পেয়েছেন বুঝি? লাল মরক্কো লেদারের, ভেতরে পাঁচটা টাকা আর একখানা গোলাপী রংয়ের রুমাল—এক কোনে লেখা 'শনিবার'—তাই না? দেখি। ব'লেই হাত বাড়িয়ে দিলো।

অনিমেষ শুধু একটা 'হাঁ' ব'লে যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাগটা পকেট থেকে বের ক'রে যুবকটির হাতে দিলো। সে বেশ দেখতে পেলো সবাই ওরা মুখ টিপে হাসছে। যুবকটি বলতে লাগলো—অনেক ধন্যবাদ। সন্তুষ্ট হলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'লো। আপনার নাম?

—অনিমেষ গুপ্ত।

—আমার নাম সমর বোস। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। সেজন্য মাপ চাইছি। দেখুন, মণিব্যাগ বস্তুটার ভেতরে থাকে টাকা পয়সা, হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে—ওর উপর নিজের নাম লিখে রাখার কোনো মানেই হয় না। স্বজাতিদের কাছ থেকে ফিরে পাবার আশাও থাকে খুবই কম। কে এত হ্যাঙ্গাম পোয়াতে চাইবে বলুন? অবিশ্যি আপনাদের মতো লোকের হাতে পড়লে ভাবনার কোনো কারণ থাকে না, এ না হয় বাড়ি বয়ে দিয়ে গেলেন, না হলে হয়তো খবর দিতেন গিয়ে নিয়ে আসতে। ভয় হয়েছে দুষ্ট লোকদের নিয়ে, এক্ষেত্রে কিন্তু ওদের দিয়েই ভরসা—হয়ত দু'পাঁচ টাকা বেশিও ভ'রে দিতে পারে।

অনিমেষ বিমূঢ়ের মতো ব'সে কথাগুলো শুনতে থাকে। কলমের কথাটা তার মনে পড়ে—ক্ষোভে লজ্জায় ক্ষিপ্তের মতো চেয়ার ছেড়ে সে উঠে পড়ে। যুবকটি পিছনে আসতে আসতে বলে—দয়া ক'রে চ'লে যাবেন না। আমার এ ফিকির খাটবে না ব'লে থিয়েটার হলে ব'সে বন্ধুরা দশ টাকা বাজি রেখেছে। তাই তো অমন পাঁচ-পাঁচটা টাকা রিস্ক করেছিলাম। বাজির টাকাটা খেয়ে যাবেন না?

ততক্ষণ গাড়িতে ব'সে অনিমেষ স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। হর্নের ফোলা গালে চাপ পড়তেই সেটা চেঁচিয়ে উঠে—'বেবি'র কান্নায় দু'কান ডুবিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে যায়, আর কোনো কথাই তার কানে পৌছয় না।

বৈচিত্র্য

ভবানীপুরের একটা বড়ো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটি সুদর্শন যুবক প্রৌঢ় দু'টি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলো। দু'তিন বছর অনুপস্থিতির পর কেন সে কলকাতায় ফিরে এসেছে সেটাই ছিলো আলাপের বিষয়-বস্তু। যুবকটি বলছিলো, 'ল পাশ ক'রে সেই যে কলকাতা ছাড়লুম, আর আসা হয়ে ওঠে নি। বছরখানেক বর্মায় মামার কাছে থেকে চেষ্টা করলাম কাঠের ব্যবসাটা বুঝতে—কাঠ নিয়ে ব্যাপার, বড্ড শক্ত ঠেকলো। এবার এখানেই প্র্যাক্‌টিস করবো ব'লে—'

হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে যুবকটি গম্ভীরভাবে দু'হাত জোড় ক'রে বললো, 'নমস্কার'। বলেই চট্ ক'রে চলতে শুরু কোরলো। ভদ্রলোক দু'টি প্রথমটা এই আকস্মিকতায় অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তারপর একটু লক্ষ্য করতেই দেখতো পেলো দু'টি মেয়ের ঠিক পিছন পিছন সে এগিয়ে চলেছে। ভদ্রলোক দু'টির মধ্যে একজন মুখটিপে হেসে বললো, 'কলকাতায় ব'সে এই প্র্যাক্‌টিস্‌ই করবে।'

যুবকটি এভাবে এগিয়ে চলেছে। উল্‌টোদিক থেকে সাহেবি পোশাক পরা একটি যুবক মুখে পাইপ ঝুলিয়ে হন্‌ হন্‌ ক'রে পাশ কাটাতে গিয়ে সেই যুবকটিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো, 'আরে সুশান্ত যে! কবে—'

কথা শেষ করতে না দিয়ে সুশান্ত গম্ভীর মুখে—'সঙ্গে মেয়েরা

রয়েছেন, তোমার বাড়ি গিয়ে দেখা করবো।' ব'লেই চলতে শুরু করলো।

সাহেবি পোশাক-পরা যুবকটির নাম অরুণ। অরুণ সুশান্তকে চেনে আজ বহুদিন থেকে। তার অদ্ভুত রকমের চালচলন ও কথা-বার্তা ছাত্রাবস্থায় অরুণকে বড়ই আনন্দ দিতো, তাই এক সময়ে উভয়ের মধ্যে ছিল বিশেষ সম্প্রীতি।

সুশান্তের স্বভাবগত অস্বাভাবিকত্বগুলো জানা থাকা সত্বেও এতদিন পরে প্রথম সাক্ষাতে এ রকম ব্যবহার পেয়ে অরুণ কিছু-না-বুঝতে-পারা রকমের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো সুশান্ত যে দিকে এগিয়ে চলেছে সেই দিকে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেভাবে থাকতে তাকে হলো না। একটু পরেই হো হো ক'রে সে হেসে উঠলো।

অনতিদূরে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সিতে মেয়ে দু'টি চেপে বসলো, গাড়ি স্পীড নিয়ে বেরিয়ে গেল। সুশান্ত দাঁড়িয়ে পড়লো ফুটপাথের মাঝখানে। হাসির শব্দে পিছন তাকিয়ে দেখলো অরুণ দাঁড়িয়ে ঘটনাকে বিশেষভাবে উপভোগ করছে। এগিয়ে এসে তার কাছে দাঁড়াতেই সে তার হাত ধ'রে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'হ্যাল্লো ওল্ড বয়, ওল্ড হ্যাবিট আজও যায়নি দেখছি ?'

'চেহারা জোড়া ভালো ; পরিচ্ছদে জীবিত বা মৃত কারুর মালিকানা স্বত্বের ছাপ নেই উৎসাহ বেড়ে গেল।'

'বয়েস হয়েছে এখন এসব ছেড়ে দাও, কবে কে কোথায় অপমান করে দেবে।'

'কিচ্ছু ভয় নেই , বাংলাদেশে অন্যায় করার লোকের যেমন অভাব, শাস্তি দেবার লোকেরও তেমনি অভাব।'

ব'লেই পকেট থেকে একমুঠো আধপোড়া সিগারেট বের করলো। অরুণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ও গুলো আবার কি ?'

'মুখপোড়া ব্র্যাণ্ড, সুবিধে অনেক—অকারের বালাই নেই। দেশলাই !'

অরুণ একটু হেসে বললো, 'ঠিক আগের মতোই আছো দেখছি। যাক, তোমার সঙ্গে সন্ধ্যায় কোথায় দেখা হতে পারে বলতো ?'

'যে কোনো অস্থানে সুস্থানে।' সুশান্ত জবাব দেয়।

'বেশ তো, এসো না 'ন্যানকিন-'এ, সন্ধ্যা সাতটায়—কেমন এই কথা রইলো।'

'অতীব আনন্দের কথা।'

'আচ্ছা, সো লঙ্—'

'বাই বাই'

সন্ধ্যার পর চিনা রেস্তোরাঁর একটি টেবিলের কাছে অরুণ তারই মতো অন্য একটি সুট পরা যুবককে নিয়ে সুশান্তর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। সুশান্ত আসতেই তাকে সাহেবি কেতায় অভ্যর্থনা ক'রে প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিলো পাশের বন্ধুটির সঙ্গে। 'মিঃ সুললিত ঘোষ—মিঃ সুশান্ত সেন।'

মিঃ ঘোষ সুশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো হ্যাণ্ডসেক করতে। সুশান্ত অরুণের যে হাতটা ধ'রে ছিলো টক ক'রে তুলে মিলিয়ে দিলো ঘোষের হাতের সঙ্গে। নিজে দু'হাত তুলে জানালো নমস্কার। ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে ঘোষ ও অরুণ দু'জনেই হেসে উঠলো।

অরুণ সুশান্তকে বললো 'তোমার নাম সুশান্ত না হয়ে হওয়া উচিত ছিলো অন্য কিছু।'

'যার কোষে কোষে দানা, তারই নাম বেদানা—জগতে নিয়মই এই।' সুশান্ত জবাব দিলো।

বয় আসতেই অরুণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো সুশান্তর মুখের দিকে। সুশান্ত বললো, 'ভদ্‌কা।' মিঃ ঘোষের দিকে চাইতে সে বললো, 'ডিটো'। অরুন অর্ডার দিলো, 'তিনঠো বিয়ার—যাক এখন ইনটারেস্টিং টক শুরু করা যাক।' সুশান্তর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো 'বিবাহ কার্যটা শেষ করেছ?'

'করিনি, করবার আয়োজন চলছে। আজও একখানা ফটো পেয়েছি ঢাকা থেকে।'

অরুণ হেসে বললো, 'কিন্তু জানো, ঘোষ আমার হাত দেখে বলেছে বৌ নাকি ভারি সুন্দরী হবে আমার।'

সুশান্ত সোৎসাহে ব'লে উঠলো, 'আপনি হাত দেখতে জানেন?' ব'লেই ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো ঘোষের সামনে।

গেলাসে খুব একটা লম্বা টান দিয়ে ঘোষ সুশান্তর হস্তরেখায় মনোনিবেশ করলো। একটু বিচারের ভঙ্গি ক'রে বললো, 'ওয়াইফের প্লেসটা খুবই ভালো। আপনার প্রতি য়্যাটাচমেন্ট থাকবে অস্বাভাবিক রকমের, অর্থাৎ, আপনারা যাকে বলেন চরিত্র, সেটি হবে অতি চমৎকার।'

'স্বেচ্ছায় না বাধ্য হয়ে?'

'তার মানে?' ঘোষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

'মানে, হতে পারে, এমনি একটা চেহারা হবে, দেখে চরিত্রে আঘাত করার আগ্রহই হবে না কারুর।'

অরুণ ও ঘোষ একযোগে হেসে উঠলো। সুশান্ত হাত টেনে নিয়ে প্রশ্ন করলো, 'মিঃ ঘোষ আপনিও কি বিয়ে করেন নি।'

ঘোষ ফোস্ করে ছাড়লো একটা দীর্ঘশ্বাস।

অরুণ বললো, 'কিছুদিন যাবৎ ঘোষের বিরাট একটা বৈরাগ্য এসেছে নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে, বিয়ের কথা বললে তো ক্ষেপেই ওঠে।'

সুশান্ত অত্যন্ত আশ্চর্য হওয়ার মতো চেহারা ক'রে বললো, 'তাই নাকি! কেন মিঃ ঘোষ?'

ঘোষের চোখ মুখ ছলছলিয়ে উঠলো। সে বললো, 'সুশান্তবাবু একদিন আমিও এসব কথা বলতাম। প্রাণে আমারও স্ফূর্তি ছিলো প্রচুর, কিন্তু—'

সুশান্ত ঘোষের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, 'যে সব দুঃখ ভেসে ওঠে, সে তো হালকা দুঃখ, তা নিয়ে আর নাই বা ঘাঁটলেন। ভল্লুক পেটে ঢুকলে আমার দুঃখ বা আনন্দ কোনোটাই হয় না। আমার শুধু ইচ্ছে করে অদ্ভুত একটা কিছু করতে। বাঙালী জীবনের একঘেয়েমি আমার কাছে মনে হয় অসহ্য। স্থবিরত্বকে আমরা বলি গাম্ভীর্য। বিশ বছরের মেয়ে, বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে পাশাপাশি বসে, চলে, পড়ে, কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। সবাই শান্ত, সুবোধ, সুশীল। এক এক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে বিনি ভল্লুকে পর্যন্ত কত কি ক'রে ফেলি। সেদিন হোটেলের কামরায় পঞ্চাশটা পেরেক ঠুকে পাঁচ টাকা জরিমানা দিয়েছি। ম্যানেজার টাকা নিতে এসেছিলো হাঁ করা পকেটের মুখে ফেলে দিলাম জলতি সিগারেট, তা নিয়ে হয়ে গেল একটা বিরাট হুলুস্থুল। বেশ লাগে একটা একসাইটিং সমথিং একটা থ্রিল—'

অরুণ বললো, 'তুমি সুমিত্রা সেনের সঙ্গে পরিচয় করো, বনবে ভালো। মাসিকে সব প্রেমের গল্প ছাড়ছেন, ফুল অব থ্রিল এণ্ড

য়্যাডভেঞ্চার। কিন্তু দুঃখ ভাই, সবই গল্পে আর সিনেমায়, বাস্তবত ভাগ্যে জোটে না কিছুই।'

'জোটবার সাহসই বা কই তোমাদের? তোমার ঐ সুমিত্রা সেনকে আমি জানি, অমন ডজন্ মেয়ের সঙ্গে পরিচয় আমার আছে।'

'তুমি য়্যাদ্দিন ছিলে বর্মায়, তুমি ওকে জানলে কি ক'রে?'

'জানি হে জানি। ওর গত মাসের গল্পটা, যার মধ্যে বিবাহিতা মহিলাটি পালিয়ে গেল স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে—সেতো আমাকে উপলক্ষ্য ক'রেই লেখা।'

অরুণ বললো, 'এমনিই তো মিথ্যে বলতে বাধে না, তার ওপর নেশার ঝোঁকে খুব যে ব'লে চলেছ!'

'শুধু পরিচয় নয় হে, একটু ইশারায় তোমার সুমিত্রা সেন কেন অমন অনেক কেউ অনেক কিছু করতে রাজি, তবে কিনা—'

অরুণ বাধা দিয়ে বললো,—'এসব লম্বা-লম্বা নেশাখুরী বড়াই ছেড়ে অন্য কথা বলো।'

সুশান্ত টেবিলের উপরে গ্লাসটা চেপে ধ'রে চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললো, 'ছ্যাখো, ক্ষেপিও না, য়্যাডভেনচারাস মুডএ আছি। কি ক'রে বসবো ঠিক নেই।'

অরুণ জোর দিয়ে বললো, 'ক'রে একবার দেখাওই না, মুখের বড়াই তো ঢের শুনলাম।'

টেবিলের উপর চাপড় দিয়ে সুশান্ত বললো, 'বেট, কত বাজি বলো।'

'একশো টাকা—সুমিত্রা সেনকে নিয়ে এক্ষুনি যদি একবার বেরুতে পারো। সঙ্গে রইলেন পিশে—তেমন বেরুনো নয়। এমনি ভাবে

বেরুতে হবে, তোমাদের রিলেশানটা ঠিক যেমনটি বলেছ—না পারলে একশো দেবে।'

ঘোষ ভীতকণ্ঠে ব'লে, 'থাক না বাপু এসব—'

'শাট আপ ম্যান। রিস্‌ক তো ওর, লেট আস এনজয় দি ফান; আই'ম স্যুঅর সুশান্ত উইল লুজ।' সুশান্তকে লক্ষ্য ক'রে বললো, 'মুখের কথায় চলবে না। ঘোষ মিড্‌ল্ ম্যান, দুজনকেই টাকাটা জমা রাখতে হবে ওর কাছে।'

সুশান্ত জবাব দিলো, 'বহুৎ আচ্ছা।'

যার যার গেলাস মুহূর্তে শুষে নিয়ে তিন বন্ধু বেরিয়ে এসে ধরলো দুটো ট্যাক্সি। সুশান্ত অরুণ ও ঘোষকে ব'লে দিলো, তার ট্যাক্সি যে-বাড়ির সামনে গিয়ে থামবে সেখান থেকে অনেকটা দূরে গাড়ি রেখে তারা যেন কোনো এক জায়গা থেকে লুকিয়ে ঘটনাটা লক্ষ্য করে; এবং পরেও অনেকটা পেছন থেকেই যেন তাকে অনুসরণ করা হয়। সুশান্তর গাড়ি চললো আগে, পিছনের গাড়িতে অরুণ আর ঘোষ। ঘোষকে দেখলেই মনে হয়, তার দুঃখের সঙ্গে মিশেছে ভয়ানক একটা ভাবনা।

অরুণ ঘোষকে বললো, 'সুশান্ত মনে করছে যাকে-তাকে দেখিয়ে ধাপ্পা মারলেই চলবে। সুমিত্রা যে আমাদের পাড়ার মেয়ে। ব্যারিস্টার মিঃ দাশগুপ্ত হলেন সুমিত্রার দাদা। কিছুদিন হলো তারই কাছে বেড়াতে এসেছে। আমি যে এত খবর রাখি সুশান্ত ভাবতেই পারে নি।'

কথার প্রত্যুত্তরে ঘোষ শুধু বোকার মতো খানিকটা হাসলো।

অন্ধকার রাত্রি। দশটা তখন বেজে গেছে। বালিগঞ্জের যে

বাড়িটার কিছু দূরে সুশান্তের গাড়ি এসে থমকে দাঁড়ালো সেটাই মিঃ দাশগুপ্তের বাড়ি। মাঝখানে মস্ত একটা বাগান প'ড়ে বাড়িটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছে পল্লী থেকে। তার পরে একটা বাড়ি আদ্ধেকটা উঠে থেমে রয়েছে। সেই বাড়ির কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভারকে কি যেন ব'লে সুশান্ত নেমে পড়লো। অরুণ ও ঘোষ আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালো সেই আদ্ধেক-ওঠা বাড়িটারই একটা থামের আড়ালে, যেখান থেকে দাশগুপ্তের বাড়ির প্রায় সবটাই দেখা যায়। একতলা বাড়ি—সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। বাইরে থেকে সার্সি দিয়ে যে আলো দেখা যাচ্ছে তাই থেকে বুঝা যায় কেবলমাত্র দুটো ঘরে আলো জ্বলছে। সুশান্ত পা টিপে টিপে জুতোর শব্দ বাঁচিয়ে কোমর অবধি উঁচু দেয়ালটার সামনে গিয়ে সেটাকে টপকে পড়লো গিয়ে বাগানের ভেতর। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে এ পাশের যে ঘরটায় আলো জ্বলছিলো তারই দরজায় আস্তে আস্তে বার দুই মারলো টোকা। চেহারা ভালো ক'রে না দেখতে পেলেও অরুণ ও ঘোষ বেশ বুঝতে পারলো, যে দরজা খুলে দিলো সে স্ত্রীলোক। সুশান্ত তাকে ইশারায় চুপ করতে ব'লে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো। একটু পরেই অরুণ ও ঘোষ দেখতে পেলো বাতিটা নিভে গেলো।

ঘর থেকে সুশান্ত মেয়েটিকে নিয়ে বাগানের অন্ধকার জায়গা দিয়ে গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর নিঃশব্দে গেট খুলে তার হাত ধ'রে রাস্তায় বেরিয়ে এল। ট্যাক্সির সামনে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, সুশান্ত হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলো। ট্যাক্সিওলা দেখে শুনে ঘাব্ড়ে গিয়ে কিছু যেন বললো।

সুশান্তর জবাবটাও বোঝা গেল না, শুধু দেখা গেল সুমিত্রাকে অনেকটা যেন আলগা ক'রে তুলে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দিলো, তারপর পাশে ধপ ক'রে ব'সে পড়লো সে নিজে।

অরুণ ও ঘোষ রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে নিজেদের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সুশান্তর ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। গাড়িতে ব'সে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলো, 'এ কি কেলেঙ্কারি করলে বলতো, এখন বাড়িতে কি একটা ব্যাপার হবে ভাবতে পারো?'

'কোনো চিন্তা নেই, সে-সব আমি দেখবো।'

সুমিত্রা হতবুদ্ধির মতো পাশে ব'সে রইলো। তার মুখ চোখ দেখলেই বুঝা যায় সে ভয়ানক ভয় পেয়েছে। গাড়ি এসে দাঁড়ালো লেকের পার একটা গাছের নীচে। সুশান্ত সুমিত্রাকে আরও আশ্চর্য ক'রে জড়িয়ে ধ'রে টেনে নিলো তার কাছে। অদূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অরুণ ও ঘোষ মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে ফেললো দীর্ঘশ্বাস।

একটু পরেই সুশান্ত এসে ঘোষের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিলো বাজির টাকাটা।

সুমিত্রার বৌদি দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'খাবার দরকার আছে, না সাহিত্যেই পেট ভরবে? ব'লেই ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বললেন, 'একি, ঘর যে অন্ধকার, এত শিগগিরই ঘুম?'

বাতি জালিয়ে দেখলেন ঘরে কেউ নেই। একটু নজর করতেই

দেখতে পেলেন বিছানার উপর প'ড়ে রয়েছে একখানা চিঠি। লেখাটা সুমিত্রার হাতের। চিঠিতে লেখা রয়েছে, 'আমি চললাম। আমাকে খোঁজ করতে গিয়ে অনর্থক কেলেঙ্কারি বাড়িও না। যাই করি, যেখানেই যাই, কাল ভোরেই তোমাদের জানাবো। ওঁকে আমার শেষ প্রণাম জানিও। ইতি।'

ব্যারিস্টার-পত্নী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে খবর দিলেন স্বামীকে। তারপর উভয়ের মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। চাকরদের অলক্ষ্যে সমস্ত বাড়িটা মিঃ দাশগুপ্ত একবার খুঁজে এলেন। ব্যর্থ হয়ে পাগলের মতো বারাণ্ডার এ-মাথা ও-মাথা করতে লাগলেন পায়চারি।

স্ত্রী বললো, 'একবার ওর বরকে খবর দিলে হয় না?'

ব্যারিস্টার সাহেব ধমকে উঠে বললেন, 'তুমিই সব কিছুর জন্যে দায়ী। জোর ক'রে তুমিই তো ধ'রে এনেছ ওকে বেড়াবার জন্যে।'

'আমি কি জানতাম এমন হবে?'

'আমি ঠিক বুঝেছি কোন হতভাগার সঙ্গে গেছে—যেদিন থেকে সাহিত্য শুরু করেছে সেদিন থেকেই জানি জাহান্নামে যাবে।'

'কিন্তু সুমিত্রা তো তেমন মেয়ে নয়।'

ব্যারিস্টার সাহেব ধমকে উঠে মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, 'যাও আর ন্যাকামি করতে হবে না, তোমরা সব সমান।'

এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর একখানা ট্যাক্সিকে দেখা গেল বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে।

দাশগুপ্ত ও তাঁর পত্নী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে সে দিকে তাকালেন। একটি যুবক এবং যুবতী গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি বিদায় ক'রে দিলো। বাড়ির ভেতর ঢুকে সটান এসে উপস্থিত হ'লো বারাণ্ডায়। মিঃ

দাশগুপ্ত আশ্চর্য হয়ে সুশান্তকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার সঙ্গে ওর দেখা হলো কোথায় ?'

'আমার সঙ্গেই তো গিয়েছিলো।' একটা চেয়ার টেনে সুশান্ত বসলো।

'নিজের বৌকে নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো, সে-কথা মানি, কিন্তু আমাদের এরকম এ্যাঙ্‌জাইটিতে ফেলবার তোমার কোনো রাইট নেই।'

সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোরই বা কি রকম আক্কেল বলতো ?'

সুমিত্রা ব'লে উঠলো, আমার কি দোষ, আমাকে কিছু বলতে বা করতে ও সময় দিলো কই। জোর ক'রে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলো গাড়ির ভেতর।'

সুমিত্রার বৌদি চিঠিখানা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু এই চিঠি—'

'চিঠি ?' সুমিত্রা চম্‌কে উঠলো।

জবাব দিলো সুশান্ত। 'চিঠিটা ওর গল্পের খাতা থেকে ছিঁড়ে আমি রেখে গেছি—দেখো, নীচে নাম নেই। বুঝলে বৌদি, সুমিত্রার গল্পের নায়িকাদের অনেক খুঁজেও পেলাম না। গল্প প'ড়ে এদিকে মাথা হয়ে আছে গরম, একটা কিছু না করলেই নয়। নায়িকাদের অভাবে চুপ ক'রে থাকলো, ভাবলাম তার চাইতে নিজের বৌকে নিয়েই ইলোপ করা যাক।' মিঃ দাশগুপ্তকে লক্ষ্য ক'রে বললো, 'রাগ কোরো না ব্রাদার, এমনধারা বিপদের স্বাদটা নির্বিঘ্নে পেয়ে যাওয়া কম লাভের কথা নয়। মিনিট পাঁচেকের জন্যে মাপ করতে হচ্ছে ; মোড়ে বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে, চা-এর নেমন্তন্নটা ওদের ক'রে আসি। এমন একটা সুকর্মে উৎসাহ দিতে গিয়ে যে-টাকাটা ওরা হাতছাড়া করেছে তার কিছুটা ওদের খাওয়ানো উচিত।'

সুরভি

নাম তার সুরভি। দিনের বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় সুরভি জানালার পাশে ব'সে আছে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। টানা-টানা ভ্রূর নীচে সুন্দর এক জোড়া চোখ। দৃষ্টির মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। সামনে-চাওয়া-ফটোর চোখের মতো সে-চোখ সবাইকে সমান ভাবে সন্তুষ্ট করে, যেদিক থেকেই তাকায় মনে ভাবে তারই দিকে ওর দৃষ্টি। অধিকন্তু চাউনির মধ্যে একটা স্নিগ্ধ আবেশ মাখানো ভাব আছে যা ভুল বুঝবার পক্ষে সাহায্য করে সবচাইতে বেশি। সাধারণ দৃষ্টিতে সুরভিকে বেশ সুন্দরী ব'লে মনে হয়। নাকের উচ্চতা স্বাভাবিকত্বের মাত্রা ছাপিয়ে গিয়ে থাকলেও অসুন্দরের গণ্ডিতে গিয়ে পড়ে নি।

শুধু যে আশপাশের যুবকদের নিকটেই সুরভি সুপরিচিত তা নয়, ও পথ দিয়ে সচরাচর যারা চলে তারাও ঊর্ধ্বমুখী হয়ে জানালাটার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ না ক'রে যায় না। একদিন সুরভির নামে এক-খানা উড়ো চিঠি এল। কার্ডে লেখা। এ ভাবে চিঠি পাঠানোর রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক পিঠে তার চলচ্চিত্রাকাশের একটি নারী তারকার চিত্র, অপর পিঠে গুটিকয় আপত্তিজনক নিবেদন ও আবেদন। কার্ডে লেখা, অতএব গোপন করার দুরভিসন্ধি নেই, এ একটা প্রকাণ্ড কৌতুক, নয়তো অবদমিত বাসনার এক বিকৃত প্রকাশ। সে যা-ই হোক, এ চিঠি আসার পর প্রতিবেশীদের পরম পরিচিত যুগল নয়ন

স'রে গেল দৃষ্টির আড়ালে, তার স্থানে বন্ধ গবাক্ষের অগণিত নয়ন উন্মীলিত পল্লব নিয়ে তাকিয়ে রইলো রাস্তার দিকে।

চিঠিটা পড়েছে সুরভির মা'র হাতে। সুরভির মা সৌদামিনী অত্যন্ত রাসভারী প্রকৃতির, সমস্ত পরিবারটা চলে তাঁরই নির্দেশে। বাবা ধীরেশবাবু নির্বিরোধ শান্তিপ্রিয় লোক, তাঁর অস্তিত্বের মূল্য এক সওদাগরি আপিসে দেড়শো টাকায় ধার্য হয়ে গেছে, তার বাইরে কোথাও হতে কোনো মূল্য তিনি দাবিও করেন না। সৌদামিনীর পারিবারিক অনুশাসন মেনে পুত্রকন্যাদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে দিন অতিবাহিত করেন। সৌদামিনী আধুনিক ভাবধারার মোটেই পক্ষপাতী ন'ন, নারী-পুরুষের অবাধ বা সবাধ মেলামেশা কোনোটাই তিনি পছন্দ করেন না। মেয়েদের চালচলনের উপর তাঁর প্রখর দৃষ্টি; হঠাৎ এই চিঠির আবির্ভাব সেই খর দৃষ্টিকে খরতর ক'রে তুললো। জানালাটা সজোরে বন্ধ ক'রে দিয়ে সৌদামিনী সুরভিকে নিয়ে পড়লেন। খুব শক্ত রকমের বকুনি দিয়ে শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিলেন ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটলে আচ্ছা ক'রে মার দিয়ে বাড়ি থেকে বা'র ক'রে দেবেন।

শাস্তির শেষের অংশটা বিশ্বাস না করলেও প্রথমাংশ সুরভি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। বকুনি খেয়ে সুরভির মন যত খারাপই হয়ে থাক, তার উদ্দেশ্যে কে একজন চিঠি দিয়েছে ভাবতে গিয়ে ওরই মধ্যে মনে-মনে সে একটু গর্ববোধ না ক'রে থাকতে পারেনি। এখন সুরভির বেশির ভাগ সময় কাটে ভিতরের দিককার বারান্দায় সাংসারিক কাজকর্ম নিয়ে। লেখাপড়ার দিকে আকর্ষণ তার কোনো কালেই নেই, স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধই ক'রে দিয়েছে, প্রাইভেট পড়েই

নাকি ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা সে পাশ করবে। সন্ধ্যা বেলা নীলা ও ইলা যখন স্কুলের পড়া তৈরী করতে বসে, সুরভিও একখানা বই খুলে বসে তাদের পাশে।

সুরভি, নীলা ও ইলার পড়াশুনা তত্ত্বাবধানের ভার কিছুদিন থেকে তাদের ন'কাকু অজিতের উপরই ন্যস্ত আছে। অজিত ধীরেশবাবুর জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাই, কলেজ থেকে বেরিয়েই কলকাতা এসেছে চাকরির খোঁজে। খোঁজ করলে চাকরির খবর মেলে কিন্তু চাকরি মেলে না এটা আবিষ্কার করার পর থেকে অতবড় একটা অনিশ্চয়তার পিছনে ছুটে বেড়াবার আগ্রহ তার মন থেকে উবে গেছে। বাড়িতে ব'সে-কাটানোটা তার চিরকেলে অভ্যাস, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে যেটুকু দৈহিক সঞ্চালন প্রয়োজন সেটুকু অজিত হস্তপরিমিত স্থানের মধ্যে কতকগুলো প্রক্রিয়া দ্বারা বজায় রেখে চলে। অজিত একটু অসামাজিক, বাইরের দশজনের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা সে কোনো কালেই করতে পারে না। বিশেষ ক'রে অপরিচিত মেয়েদের সংস্পর্শে আসাকে সে মনে করে ভয়াবহ। অনাত্মীয়া তো দূরের কথা, আত্মীয়তাটা একটু দূর হলে পর্যন্ত চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে অজিতের বেশ কিছুটা দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। এ দিক দিয়ে তাই তার একটু সুনামও আছে। সুরভি, নীলা ও ইলাকে নিয়ে যখন সে রাস্তায় বের হয় মুখখানাকে ক'রে রাখে জমাট ও অভিব্যক্তিহীন। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রাস্তা চলে, পরিচিতদের পাশ কাটিয়ে যায় অপরিচিতের মতো—কারণ সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে; এমনি গুরুতর সে মেয়েদের সম্পর্কে।

সৌদামিনীর বিশেষ স্নেহের পাত্র অজিত। সৌদামিনীর প্রীতি ও

সহানুভূতি এ পরিবারে শান্তিতে দিন কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট। অজিত পরিবারের মধ্যে চলে ফেরেও খুবই সহজভাবে। হয় রান্নাঘরে বৌদির কাছে ব'সে গল্প করে নয়তো ভাইঝিদের নিয়ে হৈ-হল্লায় সময় কাটায়। ইলা ছোট তাই বড একটা পাত্তা পায় না, নীলা মাঝারি, তাকে খেপিয়ে বেড়ানো অজিতের মস্ত এক কাজ। বিনুনি ধ'রে টান দেওয়া, দু'হাতে তুলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে ধুপ ক'রে ফেলা, কখনো গালে দাড়ি ঘ'ষে দেওয়া, একটা-না-একটা কিছু লেগেই আছে। নীলাও দিনের ভিতর দশবার ছোটে নাকি মা'র কাছে নালিশ জানাতে। ছুটোছুটি কাড়াকাড়ি চলে সুরভির সঙ্গে। সামান্য একটা চুলের ফিতা বা ন'কাকুর রচিত দশবার পড়া একটা কবিতাকে উপলক্ষ্য ক'রে ধস্তাধস্তি চলতে থাকে, হয়তো বস্তুটিকে জয় করবার জন্যেই সহজে শেষ হ'তে চায় না। সস্নেহ তিরস্কারে সৌদামিনী বলেন—কি দস্যিই হয়েছে এগুলো, এদের জ্বালায় আর বাড়িতে টেকা যাবে না—

চিঠির কথা অজিত জানে না, শুনলে ক্রোধে নিরর্থক ছটফট ক'রে বেড়াতো। কিন্তু সুরভির সামান্য পরিবর্তনটুকু সে লক্ষ্য করেছে। তাই সন্ধ্যায় পড়াতে ব'সে জিজ্ঞেস করে—কিরে অমন মুখ গোমড়া ক'রে আছিস কেন, কি হয়েছে?

সুরভি যেমন ছিল তেমনি বইএর উপর ঝুঁকে রইলো। জবাব দিল নীলা, বললো—মা বকুনি দিয়েছে।

—কেন?

কিছু একটা জবাব দেবার পূর্বেই পাশের ব্লক থেকে হারমনিয়মের সুর ভেসে আসে, তিন বোন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। ইলা সোজা হয়ে ব'সে বলে—অনিলেশবাবু গান গাইবে, না-রে দিদি—কি মজা!

অজিত ধমক দিয়ে বললো—রাখো মজাটা দেখাচ্ছি। যা লিখতে দিয়েছি লেখ্ ব'সে শিগগির। তারপর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলে, এ ভদ্রলোকেরও সময় অসময় নেই, পডাশুনার সময় শুরু ক'রে দেয় গান।

নীলা বললো—মাঝে মাঝে তো গায়, বডদা বলে অনিলেশবাবুর মতো গাইতে পারলে সব ছেড়েছুড়ে কেবল নাকি গানই গাইতো।

—পাকামো না ক'রে ব'সে পড়ো। ব'লে অজিত গুম হয়ে বসে রইলো। গান তখন শুরু হয়ে গেছে। এক একটা টান অজিতের নিজের কানেই এত ভাল লাগলো যে অসোয়াস্তি বোধ না ক'রে পারলো না।

মনে মনে উৎসাহ এবং আগ্রহটা সবচাইতে সুরভিরই বেশি কিন্তু সেটা প্রকাশ করার উপায় নেই। কিছুদিন পূর্বে সামান্য ব্যাপার নিয়ে অনিলেশের উপস্থিতিতে ও-বাডি যাওয়া তার নিষিদ্ধ হ'য়ে গেছে। আগে অনিলেশ বাডি আছে জানলে সুযোগ পেলেই সে ছুটে যেত অনিলেশের বৌদির সঙ্গে গল্প করতে। অবশ্য সৌদামিনীর ভয়ে অনিলেশের সঙ্গে কথা কোনো দিনই বড় একটা বলে নি। তা ছাড়া সুরভির কেমন একটা ধারণা জন্মেছে অনিলেশ লোকটা ভারি দেমাকে, আশপাশের কাউকে যেন গ্রাহ্যই করতে চায় না। একদিন অনিলেশ বাইরে যাবার মুখে বৌদিকে ডেকে পান চেয়েছিলো। পান তখন ঘরে ছিলো না, কিন্তু সুরভি উপস্থিত ছিলো, ছুটে গিয়ে বাড়ি থেকে দু'খিলি পান নিয়ে এল। অনিলেশ দাঁড়িয়েছিলো বারান্দায়, পান দু'টো বৌদির মারফৎ না পাঠিয়ে সুরভি নিজেই দিলো তার হাতে। ছোট একটি ধন্যবাদ জানিয়ে অনিলেশ বেরিয়ে গেলো।

দু'বাডির মাঝের খোলা দরজা দিয়ে ঘটনাটা দেখে অজিত তক্ষ

হয়ে গিয়েছিলো। পান দান ব্যাপারটা অনায়াসেই সে প্রাণ দান পর্যন্ত গড়াতে পারে সে দূরদৃষ্টি অজিতের আছে, তাই কথাটা সৌদামিনীর কানে তুলে সাবধান ক'রে দিতেও ক্রটি করে নি।

কোনো একটা ঘটনা যখন ঘটবার হয় আপনা থেকেই পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা গ'ড়ে উঠে তার অনুকূল হয়ে। অনিলেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার মতো সময় ও সুযোগ যে সুরভি পেতে পারে এটা সে কল্পনায়ও স্থান দেয় নি। হঠাৎ তার ছোটমাসী অসুস্থ হয়ে কলকাতা এলেন চিকিৎসার জন্যে। সৌদামিনী এ বোনকে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছেন, তাই মমতাটা একটু বেশি। নিজে যাতে সকল সময় দেখাশুনা করতে পারেন তার জন্যে বাড়িও নেওয়া হয়েছে নিকটেই। মধ্যাহ্নকালীন কাজকর্ম শেষ ক'রে সৌদামিনী অজিতকে নিয়ে চ'লে গেলেন বোনের বাড়ি। কি একটা উপলক্ষ্যে ইস্কুল কিছুদিনের জন্যে বন্ধ তাই নীলা, ইলাও ছিলো বাড়িতে। ব্যারামটা নাকি তেমন ভাল নয় তাই তিন মেয়েকে সৌদামিনী রেখে গেলেন শাশুড়ীর হেফাজতে।

অপরিমিত শাসনের নীচে কন্যাত্রয়ের মন কতোটা কোণঠাসা হয়ে থাকে ধরা পড়ে মাতার অনুপস্থিতিতে। তিনটি প্রাণী যেন বাড়িতে ঝড় বইয়ে দিলো। রাতারাতি সমগ্র ভারতবর্ষটা স্বাধীন হয়ে গেলে ব্যাপার কি ঘটবে এ যেন তারই একটুকরো নমুনা। পিতামহীর চোখ নেই, তাই চোখে ধুলো দেবার ভাবনাও নেই। সুরভি চ'লে এল অনিলেশদের বাড়ি। অনিলেশ বাড়িতেই ছিলো, জিজ্ঞেস করলো—বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি? সুরভি অনিলেশের চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, কিছু জবাব দিলো না।

অনিলেশের বৌদি বললো—মা বাড়ি নেই বুঝি।

একটু পরে নীলা, ইলাও এসে উপস্থিত হলো। দেখতে দেখতে সমস্ত আবহাওয়াটাকে ক'রে তুললো ওরা হাল্‌কা ও মধুর। সুরভি অনিলেশকে অনুরোধ জানায় একটা গান শোনাতে, সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দেয় যে সুযোগ পেলে সে অনিলেশের কাছে গান শিখতো। সুরভি যে এমন সহজভাবে মেলামেশা করতে পারে অনিলেশ ভাবতেও পারে নি।

পরের দিন সুরভি ও অনিলেশের পরিচয়টা হলো আর একটু গভীর। অনিলেশের মনে হয় সুরভি যেন একটু সহজলভ্য। আবার ভাবে না-ও হতে পারে—হয়তো সময় ও সুযোগ স্বল্প ব'লে গতিটা ওর একটু দ্রুত। সৌদামিনী নিয়মিত দুপুরে ঘণ্টা দু'তিনের জন্যে চ'লে যান ভগ্নীর পরিচর্যা করতে, অতএব এদিকেও নিয়মে ব্যাঘাত ঘটাবার কোনো কারণ থাকে না।

একদিন অনিলেশ সুরভিকে জোর ক'রে ধ'রে বসে গান গাইবার জন্যে। সুরভি পালিয়ে যাবার ভান ক'রে অনিলেশ চট ক'রে তার হাতটা ধ'রে ফেলে। সুরভি মুখে বলে 'ছাড়ুন,' কিন্তু ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা সে করে না। অনিলেশ তর্জনী দিয়ে সুরভির হাতের তেলোটা চুলকে দিয়ে চাপা গলায় বলে—বিলেতে অনেক লোকের সামনে এমনি ক'রে মনের কথা বলে।

—এটা তো আর বিলেত নয়। সুরভি লজ্জিতভাবে জবাব দেয়।

—না হোক বিলেত তবু জবাব দিলে ঠিক বুঝবো।

অনিলেশ আশানুরূপ জবাবও পায়। তারপর উভয়ের পরিচয়টা নিবিড় হ'তে বেশিদিন প্রয়োজন হয় না। মনের সন্ধান পেলে

জনতা ভাল লাগে না, অনিলেশ ও স্থরভি কেবলই আড়াল খুঁজে বেড়ায়। শীতের দুপুরটা শুয়ে কাটানো যে সবচাইতে আরামপ্রদ সেটা ঘোষণা ক'রে অনিলেশ চ'লে যায় নিজের ঘরে, স্থরভি নীলা ও ইলাকে নিয়ে গল্প জমিয়ে বসে বৌদির সঙ্গে, এক ফাঁকে বাড়ি থেকে ঘুরে আসার নাম ক'রে গিয়ে উপস্থিত হয় অনিলেশের ঘরে।

দিনের পর দিন স্থরভির সঙ্গে পরিচয়টা নিবিড় হবার ফাঁকে-ফাঁকে দু'একটা ঘটনা স্থরভি সম্পর্কে অনিলেশের মনে এক প্রতিকূল চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করে। একদিন স্থরভির ঘাড়ের দিকে নজর পড়তে অনিলেশ বলেছিলো—গ্রীবা নারী রূপের একটা অঙ্গ, সেখানটা অমন অপরিচ্ছন্ন রাখতে হয়! ব'লে স্থানটা ঢেকে দেবার জন্যে টান দিয়ে খোঁপাটা দিয়েছিলো খুলে। একটা ঢাকতে গিয়ে মুক্তিলাভ করেছে অন্যটা—এই নাকি কেশের সৌরভ! ব'লে টেবিল থেকে এসেন্সের শিশিটা তুলে কাত ক'রে ঢেলে দিয়েছে সবটা স্থরভির মাথায়।

স্থরভির সান্নিধ্যের নিবিড়তা থেকে তার অপরিচ্ছন্নতার যে মাত্রা অনিলেশের কাছে ধরা পড়েছে তাতে তার মার্জিত রুচি দস্তুরমতো আঘাত পেয়ে স'রে যেতে চেয়েছে। এ ছাড়া অনিলেশ যখনই স্থরভির মুখখানা তার চোখের সামনে তুলে ধরে, শুধু স্থরভির নাক নয়, তার মুখের গঠন থেকেও কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকত্বের আভাস তার রূপকে ছাপিয়ে অনিলেশের চোখের সামনে ভেসে উঠে। সে-বস্তু কি এবং কোথায় তা নির্দেশ করবার ক্ষমতা অনিলেশের নেই। সে শুধু এটা উপলব্ধি করে। অনিলেশের মনস্তত্ত্বের কোন এক বই-এ পড়েছিলো, দৈহিক অস্বাভাবিকত্ব মানুষের প্রকৃতিকেও স্পর্শ করে—কথাটা স্মরণ ক'রে মন তার দ্বিধায় ভ'রে ওঠে।

উপভোগান্তে স'রে পড়বার মতো প্রবৃত্তি অনিলেশের নয়, তাই সুরভির কোনো ত্রুটি ও অভাবকে চিন্তার মধ্যে বড় স্থান না দিয়ে সে পারে না। একদিন আঁচলের কোণ ধ'রে টান দেওয়াতে সুরভির কাপড়ের খানিকটা ফেঁসে গিয়েছিলো, মুহূর্তের ভগ্নাংশমাত্র যে-ভাবটা সুরভির মুখের উপর ভেসে উঠেছিলো, পরমুহূর্তের শত হাসি ও তাচ্ছিল্য তাকে মুছে দিতে পারেনি অনিলেশের মন থেকে; এমনি-ধারা ছোটখাটো বিষয়ের ভিতর দিয়ে নিজের অন্তরের সংস্কৃতির সঙ্গে সুরভির অন্তরের ব্যবধানের পরিচয় পেয়ে অনিলেশ দুঃখ বোধ করেছে। এক-একদিন মনে করেছে নিজেকে প্রশ্রয় আর সে দেবে না, কিন্তু ভোরের জমাট সঙ্কল্প দুপুরের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় কোথায় যেন উবে গেছে। যুক্তির চেয়ে যৌবন যার শক্তিমান, মনের অতৃপ্ত তরফটাকে প্রবোধ দিতে কোনো না কোনো যুক্তি তাকে খুঁজে বার করতেই হয়। অনিলেশ ধ'রে নেয় এটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাময়িক প্রভাব, তার জীবনের গণ্ডিতে এসে একবার পড়লে সুরভি আপনা থেকেই তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠবে।

অনিলেশ ও সুরভির হাবভাব ও গতিবিধি অনিলেশের মা ও বৌদির চোখ এড়ায় নি। অনিলেশের মা সুরভিকে তেমন পছন্দ করেন না, তা ছাড়া ব্যাপারটা এভাবে গড়াতে দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। ছেলেকে নিষেধ ক'রেও যখন ফল হলো না, কাউকে না জানিয়ে কথাটা একদিন তিনি সবিস্তারে সৌদামিনীর কানে তুলে দিয়ে এলেন। তারপর যা ঘটলো সেটা সহজেই অনুমেয়। সুরভির শ্রবণেন্দ্রিয় ও দেহের উপর দিয়ে যতটা বর্ষণ সম্ভব বর্ষিত হয়ে গেল। খবর শুনে অজিত ক্ষিপ্তের মতো পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলো

বারান্দায়। সৌদামিনীকে বুঝিয়ে দিলো যে সুরভির কোনো অপরাধ নেই, অপরাধ যার, সেই রাসকেলটাকে সে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে। অজিতের মতে মেয়েদের মনগুলো হলো ছোট ছোট সামন্ত রাজ্য, প্রত্যেকটি পুরুষ এক একটি দুর্ধর্ষ সম্রাট, অভিযানে বেরুলে যখন তখন দু'দশটা জয় ক'রে যে কেউ ঘরে ফিরতে পারে। অজিতের মতো লোক যারা, ক্ষমতার অপব্যবহার তারা করে না। যে শ্রেণীর লোক এ জয়ের উপর কোনো কৃতিত্ব বা মূল্য আরোপ করে তাদের প্রতি অজিতের ক্রোধটা অপরিসীম।

অনিলেশ খবর শুনে যার প্রতি যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়েছিলো কিন্তু প্রতিবাদের নিরর্থকতা বিচার ক'রে একেবারে চুপ ক'রে গেছে। সুরভিদের বাড়ির আবহাওটা কি প্রকার থমথমে হয়ে আছে সে তা বাড়ি ব'সেই অনুভব করছিলো। অনিলেশ উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু একটা স্থির করবার চেষ্টা করছে এমন সময় ঝড়ের বেগে এসে অজিত তার ঘরে ঢুকলো। অনিলেশের কাঁধে ধ'রে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো—এ সব কি ব্যাপার!

এই ধারণাতীত অসভ্যতা ও গুণ্ডামির জন্য অনিলেশ প্রস্তুত ছিলো না, সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো। তারপর অজিতের বীরত্বে বাধা দিবার জন্যে উভয় পরিবারের নারীকুলের আকুলি-বিকুলি চেষ্টা ও হৈ-চৈ মিলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করলো যে অনিলেশের মন ছি-ছি ক'রে উঠলো। সৌদামিনী অজিতকে জোর ক'রে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে শুধু অনিলেশকে নয় সমস্ত পরিবারটাকে কুৎসিত অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ক'রে অজিত ধপাস ক'রে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। অসভ্যতার ক্ষেত্রে অক্ষমতার গৌরব

অর্জন ক'রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অনিলেশ নিশ্চল হয়ে বসে রইলো তার ঘরে।

অজিতের অশ্রাব্য শব্দগুলো স্মরণ ক'রে অনিলেশ ভেবে পেলো না এর পর লোকটা নিজেই বা পরিবারের মেয়েদের চোখের দিকে তাকাবে কি ক'রে, তারাই বা ওকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে কি ক'রে।

সুরভির বড়দা' বিকাশ পড়াশুনা আর সাম্যবাদ নিয়েই মেতে থাকে, পরিবারের ব্যক্তি বা বিষয়ের সঙ্গে যোগসূত্রটা তার খুবই হালকা। পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে সমতলের বিরাট বস্তুকেও যেমন দৃষ্টিপথে খেলনার মত তুচ্ছ করা যায় জ্ঞানের সু-উচ্চ শিখরে বসে বিকাশ তেমনি পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক অনেক সমস্যাকেই তুচ্ছ জ্ঞানে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু সুরভি ও অনিলেশের ব্যাপারটা এমন একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, যে বাধ্য হয়েই আংশিকভাবে তাতে যোগ দিতে হলো।

রাত্রে বাড়ি ফিরতেই সৌদামিনী এসে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বিকাশকে বললো। বিকাশ অনিলেশের মুখ থেকেও ঘটনাটা শুনে এসেছে, সে-সম্বন্ধে কোনো আভাস না দিয়ে বললো—মূল বিষয়-বস্তুর ন্যায়-অন্যায়ের কথা ভিন্ন, কিন্তু ভদ্রলোকের রাগের প্রকাশ বা বিচার-পদ্ধতিটা ভদ্র রকমেরই হওয়া উচিত নয় কি?

অজিত সৌদামিনীর পাশেই দাঁড়িয়েছিলো, বললো—যে রাস্‌কেল এমন কাজ করতে পারে তার সঙ্গে আবার ভদ্রতা কি! ভদ্রতা যেখানে করার সেখানে আমরাও কম ভদ্র নই।

—ভদ্রলোকের ভদ্রতাটা স্থান মহাত্ম্য নয়, স্বভাব।

—তুমি বোঝ ভদ্রতা, আমি বুঝি এই ঘুষি। ব'লে হাত উঁচু ক'রে বস্তুটা অজিত দেখিয়ে দিলো।

বিকাশ তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো—হ্যাঁ, এই করুন এখন, আপনি আমাদের হ'য়ে ওর নাকে দিন একটা বসিয়ে, ওর হয়ে আবার কেউ আমার নয়তো এমন কি বাবার নাকে দিক একটা বসিয়ে—এই চলুক। ভাববেন না ওর লোকের অভাব হবে, নিম্নস্তরে এধরনের বীরের অভাব নেই। যাক, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ কি? মা'র দিকে তাকিয়ে বললো, যাও দেখি এখন, আমাকে কাজ করতে দাও। ব'লে জোর ক'রে আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়ে বই খুলে সে পড়ায় মনোযোগ দিলো।

সুরভির মনকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার ভার নিলো অজিত নিজে। কারুর সাহায্যও বিশেষ প্রয়োজন ছিলো না, সুরভির ভীতু মন শুধু কামনা করছিলো হাঙ্গামটা যাতে চুকে যায়। দিন দুই ধ'রে অজিত গম্ভীর মুখে প্রশ্ন ক'রে সুরভির কাছ থেকে তাদের খুটিনাটি সব কিছু ঘটনা জেনে নিতে থাকে, মাঝে-মাঝে নারী ও পুরুষের এ সকল দুর্বলতা সম্পর্কে দেয় নানা রকম উপদেশ।—ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে কোনো মেয়ের দিকে তাকালে তাতে তাকানোর অপবাদ থাকে না বটে কিন্তু আনন্দ থাকে। আলোচনার গাম্ভীর্যের ভিতর থেকে কিসের একটা স্বাদ আলোচনাটাকে টেনে চলতে থাকে।

দু'চার দিনের ভিতর অজিত সুরভিকে বেশ বুঝিয়ে দিলো অনিলেশ কত বড় অন্যায় করেছে তার প্রতি, এবং এসব লোক সমাজের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর। এত বড় একটা গণ্ডগোলে প'ড়ে সুরভির মন এমনিতেই মাঝে-মাঝে অনিলেশকে দায়ী করছিলো, তার উপর

ন'কাকুর সঙ্গে কথা ব'লে মন তার দস্তুর মতো বিরূপ হ'য়ে উঠলো অনিলেশের উপর। এ উপলক্ষ্যে সুরভির সঙ্গে অজিতের হৃদ্যতাটা বেশ বেড়ে গেলো। বাড়ির আবহাওয়াও এল ক্রমশ হালকা হ'য়ে। তিন বোন মিলে সন্ধ্যাটা ন'কাকুর সঙ্গে হাসি গল্পে কাটিয়ে দেয়। সুরভি কখনও জোরে হেসে উঠলে অজিত মনে-মনে ভারি সন্তুষ্ট হয়, জানে অনিলেশের কানে পৌঁছলে এ তাকে নিশ্চয়ই আঘাত করবে।

পড়াশুনা শেষ ক'রে অনেক রাত অবধি সুরভি তার ন'কাকুর শিয়রে ব'সে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে সঞ্চারমাণ চঞ্চল হাত দু'খানা চোখের দু'পাশ দিয়ে অনেকটা নেবে এসে ঘুরে যেতে কখন অজিতের একখানি হাত বুকের কাছে ধ'রে আঙুলগুলো দেয় টেনে। এর মধ্যে সুখ আছে কিন্তু স্বীকৃতি নেই—কোনো কথা না ব'লে অনেক সময় তারা কাটিয়ে দেয় এই ভাবে।

নেহাৎই জ্ঞান সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে অজিত দুপুরবেলা শায়িত অবস্থায় নর-নারীর কোনো এক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় একখানা বাংলা বই পড়ছিলো। সুরভি ঘরে ঢুকলো—কি বই ন'কাকু ?

অজিত বই বন্ধ ক'রে গম্ভীর মুখে জবাব দিলো—এ বই তোদের জন্যে নয়, বড় হয়ে পড়িস।

ছোটদের পড়া নিষেধ জনেলে পড়বার জন্যে আগ্রহে তাদের অন্ত থাকে না। সুরভি আবদারের সুরে বার বারে বলতে থাকে—দিন না একবার, কি এমন বই , আমি ছোট নেই সব পড়তে পারি—দিন না।

—বারণ করছি শুনছিস না,—কখনও ছুঁবিনে এ বই। ব'লে বই খানাকে সুরভির উপস্থিতিতেই খোলা স্যুটকেসটার মধ্যে রেখে চোখ বুজে ঘুমের আয়োজন করে।

ঘণ্টা দু'য়ের ভিতর সুরভিও পুঁথি খানা হতে যথাসম্ভব তত্ত্ব সংগ্রহ ক'রে নিতে ত্রুটি করে না।

সেদিন সুরভির মাথাটা বড্ড ধরেছিলো তাই আর ন'কাকুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া হলো না। খাওয়াদাওয়া সেরে সটান গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সে আশা ক'রে ছিলো যে ন'কাকু নিশ্চয়ই একবার খোঁজ নেবে। কিছুক্ষণ পরেই অজিত ওরিয়্যানটাল বামটা হাতে ক'রে এসে বললো—দেখি, মাথাটা বের কর, মালিশ দিয়ে দিচ্ছি।

এক হাতে অজিত কপালে মলম ঘ'ষে দেয় অপর হাতটা তার, হয়তো অসহ্য বেদনার দরুণ সুরভি চেপে ধ'রে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে কখন যে সে হাতটা সুরভির বুকের উপর এসে স্থান নেয়, ওরা যেন জানতেও পারে না। ক্রমে অজিতের হাতটা তার সমস্ত যুক্তিকে তুচ্ছ ক'রে মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পরের দিন অজিত সুরভির চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। সুরভিও চেষ্টা করে না সহজ ভাবটা ফিরিয়ে আনতে। কেমন একটা গ্লানি নিয়েই আজ সে শয্যা ত্যাগ করেছে। গতরাত্রে বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে কেবল অনিলেশকেই সুরভি স্বপ্নে দেখেছে। তার ধারণা হয়েছিলো অনিলেশকে মন থেকে সে অনেক দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছে, কিন্তু আজ ঘুরে ফিরে কেবল তারই কথা মনে প'ড়ে বুকটা যেন তার ব্যথায় ভ'রে উঠতে লাগলো। প্রথম পরিচয়ের দিনটি থেকে একে-একে সে প্রত্যেকটি দুপুরের কথা চিন্তা ক'রে যেতে লাগলো, মন তার স্মৃতির মাধুর্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। অনিলেশের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কিনা শুনবার জন্যে সুরভি কান পেতে

রইলো। সেই অপমানজনক ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনিলেশের একটি কথাও তার কানে এসে পৌছয় নি, সে এখানে আছে কিনা তাও সঠিকভাবে তার জানা নেই। শেষ দিনের ঘটনা স্মরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বড়দা'র মুখের কয়েকটি কথা মনে পড়ে গেলো।

দিনকয়েক পূর্বে সুরভি তার ন'কাকুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে খিলখিল ক'রে হেসে উঠছিলো। বিকাশ ডাক দিয়ে চাইলো এক গেলাস জল। সুরভি গেলাসটার জন্যে অপেক্ষা করছিলো, বিকাশ তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো—অনিলেশকে কেউ অপমান করলে তার উপর তোর রাগ হয় না?

—যদি অন্যায়ই হয়ে থাকে তবে তার শাস্তি দিয়েছে ব'লে রাগ করবো কেন।

সুরভি যে কোনো উত্তর দিতে পারে বা দেবে বিকাশ ভাবতে পারে নি। একটু আশ্চর্য হয়ে সুরভির মুখের দিকে একবার তাকালো, তারপর বললো—'যদি' যতক্ষণ রয়েছে মীমাংসার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিলো—আর রাগ যখন আপনা থেকে হয় নি তখন কর্তব্য হিসেবে না হওয়াই ভালো।—থাক, এসব কথা তুই বুঝবি নে—অনিলেশ ভুলই করেছিলো দেখছি, আচ্ছা যা এখন।—

সেদিন সুরভি বড়দা'র কথাগুলো তেমন ক'রে মনে স্থান দেয় নি, আজ ভাবতে গিয়ে প্রত্যেকটি কথার মর্ম যেন সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলো।

বিকেলবেলা থেকে হঠাৎ সুরভি খুব হালকা ভাব নিয়ে অজিতের সঙ্গে হাসি গল্প জুড়ে দিলো। সুরভির এই স্বাভাবিক সহজ ভাবের আওতায় এসে অজিতের মন থেকেও সমস্ত দিনের গ্লানি ও কুণ্ঠার

ভাবটা যেন অপসারিত হয়ে গেলে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই সুরভির আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো। চোখের দরুণ মাঝে-মাঝে সৌদামিনীও মাথার ব্যথায় কষ্ট পান, তাই চিন্তিত হয়ে পরের দিনই ডাক্তার ডেকে পরীক্ষা করানো মনস্থ করেন।

আজ সুরভি খেতে পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠলো না। অজিত পড়ে গেলো মস্ত একটা দ্বিধার মধ্যে, পরিচর্যার ভার নিতে আজ সে সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলো। কিন্তু একবার খোঁজ না নেওয়াটাই বা যেন কেমন, আহারান্তে তাই মনের আগ্রহকে যথাসম্ভব শাসনে সংযত ক'রে অজিত সসঙ্কোচে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—কেমন আছিস এখন? মালিশ দেবার কথা মুখে আনতেও তার বাধলো।

সুরভি নিজেই অনুরোধ জানালো ওষুধটা মাখিয়ে দেবার জন্যে। ঘাড় পর্যন্ত নাকি তার ব্যথায় টন-টন করছে। লেপের আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে অনাবৃত স্কন্ধদেশ অজিতের দিকে ফিরিয়ে সুরভি পাশ ফিরে শুলো। স্ট্র্যাপওয়ালা একটা ঢিলে সেমিজ তার গায়, পাশ ফিরতেই ঘেরটা সামনের দিকে ঝুলে পড়ে—শিয়রে ব'সে অজিতের মাথায় ঝিম ধ'রে আসে, জোর ক'রে সে চেষ্টা করে চোখ ফিরিয়ে নিতে।

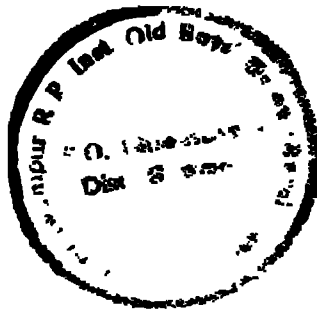
কাজকর্ম শেষ ক'রে সৌদামিনী বাতি নিভিয়ে সুরভির পাশে এসে শুয়ে পড়লেন। অন্ধকারে অজিতের সীমালঙ্ঘনেচ্ছু লুব্ধ হাতটা সুরভির ও কাঁধে ক্ষুব্ধভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সুরভি সেটাকে ধ'রে সামান্য একটু আকর্ষণ করতেই প্রশ্রয়ের আবেগে লুটিয়ে পড়লো সামনের দিকে—

ধীরে ধীরে সুরভি সৌদামিনীর একখানা হাত টেনে এনে রাখলো তার বুকে।

অজিতের ক্ষুধিত আঙুলগুলো ঘুরেফিরে এসে সুরভির হাত-খানাকে চেপে ধরতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেলো—চকিতে হাতের মুঠোটা শিথিল ক'রে দিয়ে ত্রস্তপদে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে গেলো।

সৌদামিনী বারান্দায় এসে গম্ভীরকণ্ঠে ডাকলেন—ঠাকুরপো!

অজিতের নিঃশব্দ ছায়ামূর্তি তখন সিঁড়ির অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেছে।



সওদা

মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখিয়াছি!

একদিন রাত প্রায় বারটায় ফুটপাথে একটি যুবকের সঙ্গে— হ্যাঁ, সে-ই। গরমের রাত, খামোখা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সিগারেটে টান পড়ায় একপাশে গাড়ি রাখিয়া নামিয়া পড়িলাম। দোকানপাট সবই প্রায় বন্ধ হইয়া গেছে, মাঝে মাঝে এক-একটা পান-সিগারেটের দোকান তখনও রাতের খদ্দের ধরিবার আশায় অপেক্ষা করিয়া আছে। সিগারেট লইয়া পয়সা বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিয়াছি ঠিক পিছনেই নারীকণ্ঠ শুনিয়া থামিলাম। 'এই বরফ হায়?' একটু সরিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, পাশে একটি যুবক, দেখিলে মনে হয় দু-জনেই কলেজে পড়ে। বরফের শুভ্র টুকরা হইতে এক কামড়ে কিছুটা ভাজিয়া নিয়া মেয়েটি বলিল, 'শিগগির মনুবাবু উঃ কি ঠাণ্ডা— খান আপনি।' আত্মীয় নয় তবে। দু-জনেই সহজভাবে আগাইয়া চলিল—একটু আশ্চর্য না হইয়া পারিলাম না। কিন্তু তরুণ তরুণীর অধিক রাত্রের এই অবাধ গতিবিধির মধ্যে আর যাই থাক সরস কৌতুক করিবার মতো কিছু ছিল না, ঐটুকু সময়ের ভিতর সেটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাই সপ্রশ্ন স্মরণীয় ঘটনা হইয়া বিষয়টা মনের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

আজও সঙ্গে আছে একটি যুবক, কিন্তু সে-রাতে যাকে দেখিয়া-ছিলাম সে নয়। সুগঠিত সুন্দর দেহের উপর বেশ লম্বা, মাথার চুল

উস্ক খুস্ক, সার্ট ও কাপড় বেশ ময়লা বলা চলে, খালি পা, হাতে একটা বর্ষাতি—যার চেহারায় ও চাকচিক্যে মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। মেয়েটিকেও খাট বলা যায় না। শ্যামবর্ণ, চোখেমুখে সুস্পষ্ট একটি বুদ্ধির ছাপ, ছেলেমানুষী ধরনে দু-পাশ দিয়া ঝুলাইয়া দিয়াছে লম্বা দুটা বিনুনি—এ বয়সের মেয়েদের মধ্যে বড় একটা চলতি নাই, চোখে সাদা শক্ত ফ্রেমের চশমা, খুবই সাধারণ একটি শাড়ির সঙ্গে হালকা একজোড়া স্লিপার—সব মিলিয়া মন্দ দেখাইতেছিল না।

একে একে খান দুই টেবিল পার হইয়া তারা আগাইয়া আসিল। বোধ হয় পাখার নীচে বলিয়া আমার পাশের টেবিলটা বাছিয়া লইল।

ভাল চা তৈরির জন্য দক্ষিণাঞ্চলে এই 'টি-টাইম' রেস্তোরাঁর নাম আছে। মস্ত একটা হলঘরে ছোট-ছোট টেবিলের চারপাশে চারখানা করিয়া চেয়ার, কাঠের খুপটির মুখে পরদা ঝুলাইয়া মহিলাদের সুব্যবস্থার বিজ্ঞাপন দিবার চেষ্টা ইহারা করে নাই। সকালে সন্ধ্যায় বিস্তর লোক 'টি-টাইম'-এ আসে চা খাইতে। চা-এর নেশাটা সময় অসময়ে প্রবল হইয়া দেখা দেয় বলিয়া আমাকেও দিনের ভিতর দু-একবার আসিতে হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত মেয়ে বা মহিলার আবির্ভাব কখনও দেখি নাই। বাঙ্গালী মেয়ের রেস্তোরাঁতে খাওয়া অদ্যাবধি একটা আয়োজন ও বিলাসের ব্যাপার, শুধু তাই নয় সেটা স্থান-কাল নির্বাচন সাপেক্ষ। বেলা এগারটায় স্লিপার ঘষিতে ঘষিতে গা'ছাড়া ভাবে রেস্তোরাঁতে ঢুকিয়া একদঙ্গল পুরুষের মাঝে বসিয়া এক কাপ চা খাইয়া নেওয়া বাঙ্গালী তরুণীর পক্ষে আজও এতটা অস্বাভাবিক যে অসময়ে যেকয়টি লোক উপস্থিত ছিল একবার চোখ তুলিয়া লক্ষ্য করিল। কেহ মৃদু হাসিল, কাহারও চোখ কৌতুকে চকচক করিয়া

উঠিল। দু-দিনই দুটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মেয়েটিকে দেখিয়া মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক, সে-মনোবৃত্তিকে যৎসামান্য তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে চা-এর পেয়ালা সামনে লইয়া কান খাড়া করিয়া রহিলাম। যুবকটি দোকানের ছোকরাকে ডাকিয়া দু-বাটি চা'র কথা বলিল।

ছোকরা চলিয়া গেলে মেয়েটি বলিল, 'আমার চা-এর দরকার নেই, আপনি বরং দুটো বিসকিট নিন।'

বলিল খুবই আস্তে, হাতদুই মাত্র ব্যবধানে উৎকর্ণ হইয়া আছি বলিয়াই শুনিতে পাইলাম।

'দুটো বিসকিটে আর কি এগুবে, তা ছাড়া খালিখালি ব'সেই বা থাকবেন কি ক'রে।' যুবক উত্তর দিল।

কি ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কথা শুনিয়া মনে হয় এর চা হয় তো ওর বিসকিট হয় না—কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল।

মেয়েটি বলিল, 'আমি তো যা হোক কিছু খেয়ে বেরিয়েছি, আপনার কি হবে, চট ক'রে মেস থেকে একবার ঘুরে আসুন না।'

'মেসে মিল বন্ধ, উপোস ক'রা অভ্যাস আছে, আমার জন্যে ভাববেন না।'

পাশে বসিয়া শুনিতেছিলাম। সভ্য জগতে উপকার করিবার এবং তা গ্রহণ করিবারও একটা রীতি আছে; শুধু ইচ্ছাটাই সব নয়।

মেয়েটি বলিল, 'আপনারা যেন কেমন—ঠেকা-বেঠেকায় দুটো টাকাও কি যোগাড় করতে পারেন না।'

পিছন ফিরিয়া আছি, যুবকটির মুখের ভাব দেখা গেল না। উত্তর হইল, 'ম্যাদ্দিন ধ'রে তো শুধু যোগাড় ক'রেই আসছি, আপনি না

চিনলেও জানাশোনা সবাই যোগাড়ে লোক ব'লে চিনে নিয়েছে—সেটাই হয়েছে বিপদ।'

'কি সভাই না করলেন। আমার হাত খালি ক'রে হলো তার শুরু, কান খালি ক'রে হ'লো শেষ—উঃ কি বকুনিটাই খেয়েছিলাম বাড়িতে। টিকিয়ে রাখবার আন্দাজ চাঁদাটা পর্যন্ত উঠলো না, তার মধ্যে আবার কতই না দলাদলি। যাক, আজকের উপায়টা হবে কি, এ সাত-আট মাইল পথ হাঁটতে হবে? বাব্বাঃ ভাবতেও গা-হাত-পা অবশ করে।'

'তা ছাড়া উপায় কি। দেড়টার আগেই পৌছান দরকার, ছ হাজার লোক কারখানার বাইরে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে। এ কারখানাটা যোগ দিলে স্ট্রাইকারের সংখ্যা আরও পাঁচ ছ'শো বেড়ে যাবে।'

এতক্ষণে এদের সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করিবার মত কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল। অধুনা যে শ্রমিক আন্দোলন চলিয়াছে তার সঙ্গে বিশেষ সংশ্লিষ্ট সে-বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। মতবাদের দিক দিয়া বিচার করিলে আমি এদের বন্ধুর পর্যায়ে পড়ি না, ওদের অভিযান আমাদেরই বিরুদ্ধে। কৌতুহলের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন ঘটিল।

যুবকটি বলিতেছিল, 'আপনার কালকের বক্তৃতা এমনিতে খুবই ভাল হয়েছিল, কিন্তু অতটা একসাইটিং কথা বলবেন না, তাতে সব ক্ষেপে যেতে পারে।'

'তাই কি! আমার তো তেমন মনে হয় নি। হলেই বা ক্ষতি কি—যে শান্ত এরা, একটু ক্ষেপিয়ে দেওয়া মন্দ নয়।'

ভাবিতেছিলাম, কার মেয়ে কতদূর পড়িয়াছে, এই অবাধ চলা-ফেরার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিবার কেহ আছে কিনা, আজিকার লম্বা পথটা স্লিপারে ভর করিয়াই পার হইবে, না অন্য কিছুটা উপায় করিবে। ইচ্ছা হইল বলি, মজুরদের কাছ হইতে কিছু-কিছু মজুরি নিলেইতো আর এতটা কষ্টে পড়িতে হয় না। একটু আলাপ করিবার আগ্রহ না হইল এমনও নয়। অসহযোগীদের সহযোগী হইয়া বহুদিন পূর্বে কিঞ্চিৎ স্বদেশী করা গিয়াছিল তারপরই ওজনে এত ভারি হইয়া পড়িলাম যে কোনো আন্দোলনের ঢেউ আর স্থৈর্যে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিল না। বিশেষত শ্রমিক আন্দোলনটা স্বার্থবিরুদ্ধ বলিয়া পুরাপুরি বিরুদ্ধ মত পোষণ না করা সত্বেও, নিতান্ত শখের ব্যাপার হিসাবেও বাবার জন্য তার সঙ্গে কোনো রকম যোগ রাখা সম্ভব হয় নাই। বিলেতে বসিয়া এবার দু-চার রকমের নিষিদ্ধ কর্মের সঙ্গে এ কাজটাও যৎকিঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। নেহাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত না করিলে এ জাতীয় হৈ-চৈ আজকাল মন্দ লাগে না। যদিও ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো খবরই বড় একটা রাখি না, তবু বাবার গত রাত্রের কথাবার্তায় এটুকু আভাস পাইয়াছি যে এবার তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যাতে আমাদের কারখানা নিয়া দুর্ভাবনায় পড়িবার মতো কোনো কারণ না ঘটে।

চিন্তায় বাধা পড়িল। চা শেষ করিয়া উভয়ে উঠিয়া পড়িয়াছে। অনেকটা খেয়াল বশতঃই আমিও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইলাম, মুহূর্ত মাত্র দ্বিধার পর আগাইয়া গিয়া যুবকটিকে বলিলাম, 'দেখুন—'

দু-জনেই ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার তো স্ট্রাইকারসদের মিটিং-এ যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিতে

আপত্তি আছে? শুধু এ বিষয়ে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করা, তা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

ওদের মধ্যে একবার চোখাচোখি হইল। যুবকটি বলিল, 'আমরা যাচ্ছি হেঁটে।' আমার পরিচ্ছদ ও চেহারার দিকে ভাল করিয়া একবার নজর করিয়া দেখিল। 'প্রায় আট মাইল রাস্তা, পারেন তো চলুন, আপত্তি কি?'

জানাইলাম আমার সঙ্গে গাড়ি রয়েছে, হাঁটিতে হইবে না কারুরই।

মেয়েটি কথায় যোগ দিল। 'তা হলে বলুন আমাদের আপনার সঙ্গে যেতে বলছেন। তা বেশ, এতটা পথ যে হাঁটতে হবে না সেই রক্ষে। শৌখিন লোকদের এসব শখ হ'লে তো আমরা বেঁচে যাই। এক সঙ্গে যাচ্ছি, কথা বলতে হলেই নামের দরকার, আমার নাম মীনাক্ষী, ওঁর নাম তেজেন, আপনার—'

'রজত।' ভাবিলাম শ্রমিক নেতা হইবার উপযুক্ত বটে।

গাড়ির কাছে আসিয়া মীনাক্ষী বলিল, 'বাঃ, এইটাই আপনার গাড়ি! ঢুকবার সময় চকচকে বিরাট গাড়িখানার দিকে চেয়ে ভাবছিলাম মালিকটি কে—ভাগ্যি দেখুন বেরুবার সময় মালিক আর গাড়ি দু'এর সঙ্গেই পরিচয় হ'য়ে গেল। আমি সামনের সিটে বসবো।' বলিয়া আমার পাশের সিটে আসিয়া বসিল।

তেজেন বসিল পিছনে। কিছুদূর যাওয়ার পর মীনাক্ষী বলিল, 'কান পেতে আমাদের সব কথাইতো শুনেছেন, ঐ লোকটির যে খাওয়া হয়নি তাও জানেন নিশ্চয়—অভুক্তকে খাওয়াবার শখওতো থাকা উচিত।'

'নিশ্চয়।'

'আর একেবারে চৌরঙ্গিতে গিয়ে বাঁধবেন, এদিকে রেস্তোর াঁগুলো অতি বাজে।'

আমার চোখের দিকে একবার তাকাইল ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি—অনুরোধের সঙ্গে অভিব্যক্তিটি ভাল লাগিল না। হালকা, গম্ভীর যা-ই হ'ক, সময় কাটাইবার গতানুগতিকতার হাত এড়াইবার জন্য বাহির হইয়াছি, নিরাশ না হইলেই হইল। দুজনকে নিয়া বেশ বড একটা রেস্তোর াঁতে ঢুকিলাম। তিন জনেই বসিয়াছি, মীনাক্ষী তেজেনের কানের কাছে মুখ নিয়া ফিসফিস করিয়া কি যেন বলিল। আমি আপত্তি জানাইলাম, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ওরকম কানে কানে কথা বলা অন্যায়।'

'তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত বলেইতো কানে-কানে বলতে হলো।'

বেশ সহজভাবে মীনাক্ষী জবাব দিল। বুঝা গেল অতসব এটিকেটের ধার সে ধারে না। 'বয়' আসিলে আমি কিছু বলিবার পূর্বেই মীনাক্ষী মেনু সামনে রাখিয়া নিজের পছন্দমত দু-জনের আন্দাজ খাবার অর্ডার দিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দুটো ক'রে অর্ডার দিচ্ছেন কেন?'

'আমি বাদ, খেয়ে বেরিয়েছি।'

'সে-তো যা হোক কিছু।'

'একটি কথাও কান এড়ায় নি দেখছি—সেই 'যা হোক কিছুতেই' চ'লে যাবে।'

'তা হয় না।'

বলিয়া পুনরায় 'বয়'কে ডাকিবার উদ্যোগ করিতে তেজেন গম্ভীর মুখে বলিল, 'ওঁকে পেড়াপিড়ি ক'রে কোনো ফল হবে না, অনর্থক।'

ওরই বাড়িতে যেন আমরা খাইতে বসিয়াছি, অনেকটা সেই রকম ভাব লইয়া মীনাক্ষী আমাদের খাওয়ার তদবির করিল। আহারান্তে তিনজন মিলিয়া রওনা হইয়া পড়িলাম। পথে মীনাক্ষী বলিল, 'মোটা চাঁদা আদায় করা যায় এমন একটি লোক জুটলো এত দিনে।'

'মাপ করবেন, ও শখটি নেই।'

'আচ্ছা রজতবাবু, এ আপনার নেহাৎই কি শখ,—এ কাজের ওপর সত্যিকারের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস একটুও নেই।'

'পরিচয় যখন হয়েছে ও আলোচনা অন্য সময় করা যাবে—ডাইনে?'

'হ্যাঁ।'

মীনাক্ষীই রাস্তা বলিয়া দিতেছিল। বিদেশ হইতে ফিরিয়া এদিকে আসা হইয়া ওঠে নাই, পূর্বে এ রাস্তা ধরিয়া দু-একবার আমাদের ফ্যাক্টরিতে গিয়াছি মনে পড়ে। এক মাইলের ভিতর একটা জুটমিল, তিনটা ফ্যাক্টরি। মিল-এ ধর্মঘট হইয়াছে শুনিয়াছি, এখন কোনটার উপর হানা দেওয়া হইবে জানিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম না, একটু পরেই তো জানা যাইবে।

বহু দূর থাকিতেই হাজার হাজার লোকের মিলিত কোলাহল ফিকা হইয়া কানে আসিয়া পৌঁছিল। মীনাক্ষী নড়িয়াচড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বলুন তো রজতবাবু, কি হবে দু-চার টাকা বেতন বৃদ্ধি, দু-এক ঘণ্টা শ্রম বাঁচানোর আবেদন নিয়ে এত মাতামাতি ক'রে—এতে ক'রে কারুর চাহিদা মেটে!'

গলার স্বর ঠিক স্বাভাবিক মনে হইল না। গাড়ি চালানর ফাঁকে

ভাল করিয়া একবার তার মুখের দিকে তাকাইলাম। বরাবর সামনের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, জোর হাওয়ায় মুখের উপর চঞ্চলভাবে উড়িতেছে সম্মুখের অসংলগ্ন চুলের গুচ্ছ, চোখে মুখে নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার দীপ্তি—যা কিছুক্ষণ পূর্বেও ছিল না। মেয়েটি অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ এবং অতি সহজেই উত্তেজিত হয় বলিয়া মনে হইল। বলিলাম, 'এমনি ক'রে ধীরে ধীরেই দাবির মাত্রা বাড়িয়ে চলতে হবে।'

'ওতে আমার বিশ্বাস নেই ওরা—অর্থাৎ আমরা, পাইনি কিছুই, পাবও না—এ বঞ্চনার যাতে একদিন শেষ আসে, আমাদের শেষ হতে হবে শুধু তারই চেষ্টায়। ঐ মজুরদের মাঝে গিয়ে যখন দাঁড়াই, ইনিয়েবিনিয়ে বক্তৃতা দিয়ে শক্তিশালী হাতুড়িগুলোকে যুক্তিশালী কলম বানিয়ে তুলবার প্রবৃত্তি আমার থাকে না—'

অজস্র কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি, মীনাক্ষী থামিল। অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু একি, আমাদের গ্লাস ফ্যাক্টরির সামনেই যে সকলে ভিড় করিয়া আছে! যতটা জানি তাতে বিচলিত হইবার মতো কারণ নাই বলিয়াই আমার ধারণা, তবু এই কর্মীদের সঙ্গে বহন করিয়া এখানে উপস্থিত হওয়াটাই কর্তৃপক্ষ মস্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য করিবে। অবশ্য একদিক দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে, উপস্থিত কর্মীদের নিকট আমি পরিচিত না হইবার কথা। কারণ ব্যবসার সঙ্গে আমি মোটেই সংশ্লিষ্ট নই, তা ছাড়া বহুদিন বিদেশে কাটাইয়া সবে মাত্র দেশে ফিরিয়াছি। তবু কিছুটা দূরে গাড়ি দাঁড় করাইলাম। খোলা ময়দানে এখানে ওখানে ভিড় করিয়া আছে শত শত লোক, থাকিয়া থাকিয়া তাদের মিলিত কণ্ঠে ভর করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে বিবিধ রকম দাবির হুঙ্কার।

গাড়ি থামিতেই বহুলোক আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনচার জন যারা আগাইয়া আসিল বোধ হয় মাতব্বর। তেজেন ও মীনাক্ষী তাদের নিয়া একটু তফাতে গিয়া কি যেন কথাবার্তা বলিল, তারপর সকলকে সঙ্গে করিয়া তেজেন গেল ভিড়ের দিকে আগাইয়া, মীনাক্ষী ফিরিয়া আসিল আমার কাছে। হাজার হাজার শ্রমিকের চঞ্চল গতিবিধির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মীনাক্ষী বলিল, 'রজতবাবু আমরা জিতেছি। এ কারখানার সবাই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে।'

খবর শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। এই জয় পরোক্ষে আমাকেও আঘাত করিল সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কারবার হইতে অজস্র টাকা আয় হইতেছে তার শ্রমিকদের সুখ সুবিধার জন্য দু-হাজার টাকা ব্যয় বাড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না—আছে নিশ্চয়ই, গদিতে বসিলে হয়তো তার মর্ম উপলব্ধি করা যাইবে। নানা কথা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মীনাক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলাম, দেখিতেছিলাম তার মুখ-চোখে সার্থকতার উজ্জ্বলতা। চলতি গাড়ির হাওয়ার অত্যাচারে অনেক চুল তার আলগা হইয়া উস্কখুস্ক হইয়া গেছে, তারই কয়েকটা আসিয়া পড়িয়াছে মুখে-চোখে ও গালের উপর মোটরের একপাশে হেলান দিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল, সে-দিকে চোখ রাখিয়া বলিলাম, 'আপনাকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে।'

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সঙ্কোচ বোধ করিলাম, হয়তো সঙ্গত হইল না।

মীনাক্ষী কিন্তু আমার চোখের দিকে চোখ রাখিয়া মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, 'তাই নাকি।'

দু-তিন হাজার লোক জমায়েত হইয়াছে সামনের ময়দানে,

সেখানেই সভা বসিবে। তেজেন আসিয়া মীনাক্ষীকে কহিল, 'চলুন, আপনার বক্তৃতা শোনবার জন্য ওরা অস্থির হয়ে আছে। দেখবেন, একটু রেখে-ঢেকে বলবেন, ক্ষেপিয়ে দেবেন না—বলতে দাঁড়ালে আপনার আবার খেয়াল থাকে না। লুটতরাজ বা মালিকদের সঙ্গে একটা দাঙ্গা বেধে গেলে ভয়ানক ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে।'

মীনাক্ষী কোনো জবাব না দিয়া আগাইয়া গেল।

এই বাইশ কি তেইশ বছরের মেয়েটিকে ঘনঘন জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া সভাস্থলে একটা টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া জনতা স্তব্ধ হইল তার মুখের কথা শুনিবার জন্য। অপরিমেয় শ্রদ্ধার ছোঁয়াচে মানুষ যেন আপনা হইতেই শ্রদ্ধেয় হইয়া ওঠে, অপরিচ্ছন্ন রুক্ষ জনতার একান্তে উত্তোলিত সুকোমল নারী দেহের ঐ তেজোদীপ্ত ভঙ্গির দিকে তাকাইয়া আমার মনেও কৌতূহলের পাশে যা জাগিয়া উঠিল তাকে সম্ভ্রম ছাড়া আর কি বলিতে পারি।

বাঁধাধরা সম্বোধনের সঙ্গে বক্তৃতা যেমন শুরু হয় তেমনি শুরু হইল। সম্মুখে তার বঞ্চিত নর-নারীর এক বিরাট সমষ্টি। এ মেয়েটির মুখ হইতে তারা শুনিতে চায়, কি তাদের নাই, কি তাদের পাওয়া উচিত, কেমন করিয়া তা পাওয়া যাইবে। অশিক্ষা, অভাব, অপরিচ্ছন্নতার পুঞ্জীভূত আবর্জনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মীনাক্ষী তখন বলিতেছিল,—

'—ক্ষুধা শুধু যে তোমাদেরই তা নয়, এ ক্ষুধার জ্বালা, এ দারিদ্র আজ ভদ্র-অভদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের—সকলের গায়ে দারিদ্রের এই কুৎসিত ঘা। ভদ্রশ্রেণী তার উপর পটি জড়িয়ে গোপন করে, তোমাদের পড়ে থাকে অনাবৃত, খোলা তাই কুৎসিত, ভিক্ষুকদের মধ্যে ধরেছে পচন, তাই জঘন্য—'

'ওসব শুনতে চাইনে, মাইনে বাড়বে কিনা তাই বলো—'

যে পাশটাতে মাঝে মাঝে গণ্ডগোল হইতেছিল কথাটা সেখান হইতেই উঠিল। 'চপ্, হারামজাদ; দাও শালাকে বা'র ক'রে—' খানিক হল্লার পর গোলমাল থামিল। তেজেন আসিয়া দাঁড়াইল আমার কাছে, সভার দিকে চোখ রাখিয়াই বলিতে লাগিল, 'আমার এসে থেকে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল—এখন তো বিশ্বাসী লোকের কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেল, এ কারখানার লোকগুলো মালিকের কাছ থেকে টাকা খেয়ে এসেছে গোলমাল বাধাতে। গতবারের স্ট্রাইক নিয়ে এটার মালিকদের মীনাক্ষীর ওপর রাগ রয়ে গেছে, সব দাবি মেনে নিয়ে ফ্যাক্টরি চালু করতে হয়েছিল কিনা— কিন্তু মজুরগুলো কি বেইমান!'

গতরাত্রির আলোচনা ও বাবার নিশ্চিন্ততার সঙ্গে ধর্মঘটের সাফল্যের যোগাযোগ কোথায় এখন বুঝিতে পারিলাম।

মীনাক্ষী অমন বেয়াদব শ্রোতার সূত্র ধরিয়াই হয়তো বলিতেছিল,—

'—মাইনে বাড়ানো তো দূরের কথা, কোনো সুখ সুবিধাই কবুল আমি করছি না। তোমরা পাবে না কিছুই, তোমরা—'

'কিছু মিলবে না বছে বছে বুলি ছোনো—নাচনেওয়ালী নাচ দেখাও—'

'মারো শালাকো, চপ্‌রাও বদমাস—' অশ্রাব্য গালাগাল ও গোলমাল, তারপর হাতাহাতি। দেখিতে দেখিতে দুটা পক্ষ হইয়া গেল। অবস্থা গুরুতর বুঝিয়া তেজেন গিয়া দাঁড়াইল মীনাক্ষীর টেবিল ঘেঁষিয়া। মীনাক্ষী তখন নির্বাক সোজা দাঁড়াইয়া আছে তার উঁচু

স্থানটিতে, গালাগালি, হৈ-চৈ, মারপিট, কোনো কিছুতেই সে যেন বিচলিত নয়। বঙ্গনারীর রেশমি কাপড়ের মতো হালকা ইজ্জৎকে খাঁকির মতো শক্ত ও সহনশীল করিয়া তবে সে কর্মক্ষেত্রে নামিয়াছে।

মারপিট ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া তেজেন ও মাতব্বরদের দু-একজন মীনাক্ষীকে অনুরোধ করিল সভা ছাড়িয়া সরিয়া আসিতে মীনাক্ষী বলিল, 'ওদের ভাল ঘরদোর তৈরি ক'রে দেওয়ানো থেকে মাইনে বাড়ানো—আরও অনেক কিছু—সবতো আমিই আদায় ক'রে দিয়েছি, ওরাই আজ—'

কথা শেষ হইল না, কে যেন একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিল মীনাক্ষীর মাথা লক্ষ্য করিয়া।

মীনাক্ষী কাত হইয়া পড়িতেই তেজেন তাকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে জনতা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কে কাহার পক্ষে বুঝিবার জো নাই, চারিদিকে মারামারি আর হল্লা।

'শিগগির গাড়িতে যান।' বলিয়া তেজেন মীনাক্ষীকে বহন করিয়া গাড়ির দিকে ছুটিল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে ভাবিতে পারি নাই। যন্ত্রচালিতের মতো চিন্তাহীনভাবে ঝাঁপাইয়া গাড়িতে ঢুকিয়া স্টিয়ারিং ধরিয়া বসিলাম।

ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম 'জ্ঞান আছে?'

'না, ভয়ানক রক্ত পড়ছে—আর একটু জোরে চালানো যায় না?'

কলেজ হাসপাতালে মীনাক্ষীকে নামাইয়া লওয়া হইল। তখন তার জ্ঞান ফিরিয়াছে। আঘাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা ছিল না দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। সমস্ত মুখখানা টকটকে তাজা রক্তে লাল হইয়া

গেছে। রক্তে ভিজিয়া চোখের পাতা ভারি হইয়া ছিল, অতি কষ্টে টানিয়া ধীরে ধীরে চোখ খুলিল। নার্সে ডাক্তারে চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, আমার দিকে চোখ পড়িতেই ঠোঁটের কোণে দেখা দিল মৃদু হাসি। ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে বলিল, 'এখন কেমন দেখাচ্ছে—'

এটা বোধ হয় আমার কিছুক্ষণ পূর্বের রূপচর্চার উত্তর। এমন অবস্থায় দুঃখের ম্লান হাসি ছাড়া এ কথার জবাব আর কি থাকিতে পারে। এ হীন আক্রমণের সঙ্গে নিজের স্বার্থ ও সম্পর্কগত যোগসূত্রের জন্ত অপরাধের বোঝা আমার মনের উপর চাপিয়া মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

তেজেন গেল মীনাক্ষীর বাবা-মাকে খবর দিতে। সামান্ত সুস্থতার খবর পাওয়ামাত্র কাহারো জন্ত অপেক্ষা না করিয়া, এমন কি মীনাক্ষীর সঙ্গে পর্যন্ত সাক্ষাৎ না করিয়া সরিয়া পড়িলাম। আমার পুরা পরিচয় অবগত হইলে মীনাক্ষী ও তেজেন দু-জনেই ধরিয়া লইবে, এ তামাসা দেখাই ছিল আমার আজিকার আকস্মিক শখের একমাত্র কারণ।

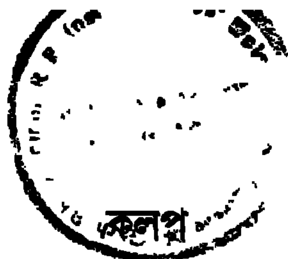
বাড়ি ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিবার সময় পিছনের সিটে চোখ পড়াতে মুহূর্তের জন্ত থমকিয়া দাঁড়াইলাম—দামী গদি ও কুশানের গায় চাপ-চাপ মীনাক্ষীর দেহের রক্ত—

বাড়ির সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল, মা আসিয়া প্রশ্ন করিলেন 'সারাদিন ছিলি কোথায় ?'

বলিলাম, 'অতগুলো টাকা দাম দিয়েছ, জিনিসটা বুঝে আনতে গিয়েছিলাম।'

আশ্চর্য হইয়া মা প্রশ্ন করিলেন 'কী জিনিস—কোথায় ?'

'দেখগে যাও, গাড়ির গদির উপর রেখে এসেছি।'



বিয়ের কয়েক দিন পরের কথা।

সুলতা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বালিশে অমন লালচে দাগ পড়ে কেন?'

অমল ড্রেসিংগাউনের কোমরবন্ধনীতে একটা প্যাঁচ ক'বে মন্থর চালে একটা সিগারেট ধরালো। ঠোঁটের কোণে হাসি। হাসির পেছনে দ্বিধাটুকু ছিলো সুলতার চোখে তা ধরা পড়লো কি না বলা যায় না। দেশলাইর কাঠিটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিভিয়ে অমল ব'লে উঠলো, 'চুলে কলপ দিই যে।'

ব'লে উঠলই বলতে হবে, উত্তরটা যেন ঠিকরে বেরুলো।

'কেন?' সুলতার মুখেচোখে আশ্চর্যের ভাব। অমল একটা কৌচের উপর বসলো। 'একুশ বাইশ বছর থেকেই কানের দু'পাশ দিয়ে চুল পাকতে শুরু করলো, অনেক কিছু ক'রে দেখলুম, কিছুতেই যখন কিছু হলো না তখন আর কি করি বলো।'

সুলতা হেসে উঠলো। 'ধ্যাৎ, এ ভারি বিচ্ছিরি—কলপ তো মাখে বাজে ফচকে লোকরা। না, এ তুমি ছেড়ে দাও; কানের দু'পাশে ক'গাছি পাকা চুল থাকলে তোমাকে কেউ বুড়ো ভাববে না—আর অন্যে ভাবলেই বা কি, আমি না ভাবলেই হলো।' সুলতা মুখ টিপে হাসে।

'এ অত্যন্ত অন্যায় ধারণা।' অমল বেশ একটু জোরের সঙ্গে বলে। 'এক সময়ে তবলা বাজালে লোকে বকাটে ভাবতো—জিনিসটার

'এ্যাসোসিয়েশন' ভালো নয়, ভালো ক'রে নিলেই হলো। দাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা, মুখে পাউডার ঘষা, এমন কি আধুনিকাদের মুখে রং মাখা, যদি চলতে পারে, কলপের অপরাধটা কি? বরং এটা শুধু বিলাসিতা নয়, বিশেষ একটা প্রয়োজনে আসে—স্থানবিশেষ বয়সের সঙ্গে চেহারার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।' গড়গড় ক'রে অমল তার যুক্তিগুলো ব'লে গেলো।

অমলের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে দিয়ে সুলতা বললো, 'তোমার অতসব কথার জবাব দিতে আমি পারবো না, অন্যায় নয় তা মানলাম, কিন্তু শুনতে কেমন যেন বিচ্ছিরি শোনায়—ভাবতেও ভালো লাগে না। ও ছাই তোমাকে মাখতে দেবো না, চুল পেকেছে তো বয়ে গেছে।'

'সে দেখা যাবে।'

দৈনিক কাগজটা হাতে নিয়ে বসবার ঘরের লম্বা কৌচটায় পা ছড়িয়ে অমল শুয়ে পড়লো। যদিও গোপন করার ইচ্ছা ছিলো না, তবুও সুলতাকে কথাটা ব'লে ফেলে মনটা কেমন যেন তার খারাপ হয়ে গেলো। মনে পড়লো তেরোচৌদ্দ বছর আগেকার কথা। প্রথম যখন চুল পাকতে শুরু করলো কথায় কথায় সে কেমন সহজে পক্ক কেশের উল্লেখ ক'রে বার্ধক্যের দাবি জানাতো। যখন থেকে কলপ ধরলো, জানা-চেনা এমন কেউ ছিল না যাকে যেচে সে কলপের গুণ-কীর্তন শুনিয়ে দেয় নি। বয়েসটা ত্রিশের কোঠায় পা দেবার পর থেকে কথাটা গুরুতর হ'য়ে গুটিয়ে যেতে শুরু করলো, হালকা ভাবে ব'লে বেড়ানো দূরের কথা কেউ তার উল্লেখ করলে অস্বস্তি বোধ করে। বিয়ে করার জন্যে ব্যস্ত সে মোটেই ছিলো না তবু পঁয়ত্রিশের

পর থেকে বয়সের গুনতিটাও এড়িয়ে চলতে লাগলো। যখন তখন ঠিকুজি নিয়ে আলোচনা করা ছিল একটা বাতিকের মধ্যে; সেটা আশ্রয় নিলো স্যুটকেসে, নেহাৎ পেশাদার গণক ভিন্ন কারুর কাছে আত্মপ্রকাশ করে না। গোপন করার বিশেষ একটা চেষ্টা নিয়ে এসব করেছে এমনও নয়, কখন যেন আপনা থেকেই স্বভাবের গুটিকয় সহজ প্রকাশ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে।

স্বলতা কলপ মাখতে বারণ করছে, কিন্তু কথাটা মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। একুশবাইশ বছরের সেই সামান্য শুভ্রতা পনের বছরে আরও ব্যাপ্ত হয়েছে নিশ্চয়ই, তা ছাড়া কলপ মেখে-মেখে চুলের রং হয়ে গেছে কটা—যেটা হবে আরও দৃষ্টিকটু।

'তোমার আপিসের সময় হয়ে গেলো, উঠবে না?' স্বলতা ঘরে ঢুকে বললো।

'হ্যাঁ, এই যাচ্ছি।'

স্বলতা চলে গেলো কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত অমলের মধ্যে নড়বার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। আপিস তার নিজের, কিন্তু কর্তা হয়েও নিয়ম ভঙ্গ সে কখনো করে নি। দিন দুই হলো সময় মতো আপিসে যাওয়া হচ্ছে না, গিয়েও কাজ কিছুই করে নি, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কর্মচারীরা সাহেবের অবস্থাটা বেশ কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করে নিশ্চয়ই। অমল সেটা বোঝে, কিন্তু কেমন একটা বিরাট ক্লান্তি এসে জুড়ে বসেছে তার সমস্ত দেহে। তার উপর মনে একটা একটানা অস্বস্তি আর ভয়। স্বলতার অমন স্বন্দর মুখচোখ, অমন স্নিগ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকাতে কেমন যেন তার ভয় হয়। অমলের মনে হয়

সুলতার চোখ দুটো রাত্রে বদলে যায়—হাড়-জমানো ঠাণ্ডা দৃষ্টি নিয়ে সেদুটো চকচক করতে থাকে।

রাত্রে সুলতা বালিশের উপর কনুইয়ে ভর ক'রে কথা বলছিলো, অমল বললো, 'বাতিটা নিভিয়ে দাও।'

'হ্যাঁ, তা হলেই মজাসে ঘুমিয়ে পড়তে পারো, না—আচ্ছা, এমন বাতি নিভানোর জন্যে অস্থির হয়ে ওঠ কেন বলতো ?'

অমল শেষের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে প্রতিবাদ করলো প্রথম কথার। শোয়া থেকে রীতিমতো খাড়া হ'য়ে ব'সে বললো, 'না জেনে শুনে এমন বাজে কথা সব বলো, কাল তুমি ঘুমোবার অনেক পরে আমি ঘুমিয়েছি—চোখ বুজে কথা শুনছিলুম, ভেবে নিলে ঘুমিয়ে পড়েছি।'

বলার ভঙ্গিতে বেশ একটু রুক্ষতা ছিলো। এতটা জোরের সঙ্গে অস্বীকার করার মতো কি আছে কথাটায় সুলতা বুঝতে পারে না, ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'তা-ই হবে, আমি বুঝতে পারি নি।'

উত্তেজনার অসঙ্গতি নিজের কাছেও বুঝি ধরা পড়ে, গলার স্বর নরম ক'রে হালকাভাবে অমল বললো, 'আজকে দেখবো তুমি কত রাত জাগতে পারো।'

'থাক জেদ ক'রে রাত জাগার দরকার নেই। কাল আপিস আছে না ?'

'থাক না আপিস, আমি তো কারুর চাকর নই।'

কর্কশতাটুকু ঢেকে দিতে আদরের মাত্রাটা অমল বাড়িয়ে দেয়।

কথায় কথায় সুলতা বললো, 'তোমার কলপের শিশি আমি ফেলে দিয়েছি—ও মাথা চলবে না।'

'আচ্ছা সে দেখা যাবে, এখন রাখো ও-কথা, সেই যে সকাল থেকে মাথায় ঢুকেছে—'

কিছুক্ষণ পর সুলতা জিজ্ঞেস করলো, 'কি গো, চুপ ক'রে আছ যে, ঘুমোলে ?'

অমল নড়েচড়ে উঠে বললো, 'না, শুনছি—বলো।'

'কি শুনছো, আমি তো কিছু বলছি নে।' সুলতা হাসলো।

একটু পরেই অমলের নিদ্রা ঘোষিত হলো। সুলতাও হেসে চোখ বুঝলো, ভাবলো লোকটির ঘুম একটু বেশি, সেটা বললে আবার চটে যায়।

জেগে থাকার একটা সঙ্কল্প মনে ছিলো ব'লেই হয়তো হঠাৎ অমলের ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে ব'সে ঘড়ির দিকে তাকালো—রাত দু'টো বাজে, সুলতা যেমন ছিলো তেমনি ভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিঃশব্দে অমল খাট থেকে নেবে এলো। ধীরে ধীরে অসংযত শাড়ির আঁচলটাকে সে টেনে দিলো সুলতার দেহের উপর। সুলতার দৈহিক কমনীয়তার অবাধ মুক্তি সে যেন সহ্য করতে পারে না, এক দিকে যেমনই মুগ্ধ হয়, অন্যদিকে তেমনি লতানো দেহের দিকে তাকিয়ে হিম-শীতল সাপের একটা চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে একটা ভয় মেশানো অস্বস্তি, যা সে অনেক চেষ্টা ক'রেও ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

পাতলা শাড়ির উপর দিয়ে ভেসে উঠেছে সুলতার শুভ্র দেহের আভা; অমল চোখ ফিরিয়ে নিলো—নিজেকে তার বড়ই অসহায় মনে হয়। মনে পড়ে অনেক বছর আগেকার আর একটি রাত্রির কথা। অরুণার দিদির বিয়েতে এক রাত্রি ছিলো সে অরুণাদের বাড়ি।

পাশের ঘরে অরুণা শুয়েছে, শুধু এ ধারণাটুকুর জন্যে শত চেষ্টা সত্বেও সারা রাত সে ঘুমোতে পারে নি, কান পেতে সজাগ হয়েছিলো। আর আজ চেষ্টা ক'রেও জেগে থাকতে পারে না কেন।

অমলের সঙ্গে অরুণার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়ে ছিলো অনেক দূর। একে একে সে-সব দিনের এক-একটি ঘটনা অমলের মনের উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে থাকে। অবশেষে একদিন মহা বিড়ম্বনা ও অসম্মানের মধ্য দিয়ে সে-পরিচয় শেষ করতে হলো, যার একমাত্র কারণ ছিলো তার আর্থিক অবস্থা। সেই থেকে নিজেকে সে মেয়েদের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে নিলো অনেক দূরে, কারণ নারীকে সঙ্গিনী হিসাবে পাবার সম্পদ তার নেই এ সত্য সে আঘাতের মধ্যে দিয়ে অনুভব ক'রে এসেছে। এ লাঞ্ছনার প্রতিক্রিয়া হলো অর্থ রোজগারে আপ্রাণ চেষ্টা। সে-চেষ্টা তার সফল ও সার্থক হয়েছে, আজ সে নামকরা ঠিকাদারদের অন্যতম।

তার ব্যস্ত জীবনে নারীর প্রবেশ পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, এই ছিলো অমলের ধারণা। কিছুদিন আগে একদিন আবিষ্কার করলো ওদের পথ-চলা অস্তিত্বকেও অস্বীকার সে করতে পারে না—তার অনিচ্ছা সত্বেও দৃষ্টিকে যেন টেনে ধরে। সঙ্গে লোক থাকলে গম্ভীর মুখে হয়তো বলে, 'অনাদিবাবুর মেয়েরা না—' বা 'বাঙালীর মধ্যেও এমন টল, স্লিম ফিগার আছে তা হ'লে', অথবা 'দিন-কে-দিন মেয়েদের স্বাস্থ্য কি হচ্ছে!'—গম্ভীর হ'য়ে একটা কিছু তাকে বলতে হয়। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন অমল স্থির ক'রে ফেললো সে বিয়ে করবে, নারীর মূল্যের তহবিল ভর্তি, তার ভাবনা কিসের।

সত্যি তো, কি তার না আছে! স্থূলতাকে সে বাড়ি, গাড়ি, এই

আসবাবপত্র—জীবনের শক্তি নিংড়ে যা কিছু অর্জন করেছে সবার মাঝে এনে বসিয়েছে, তবু এই অসহায় দৈন্য-বোধ কেন! অরুণার সেই অমল যেন মিশে আছে তার সম্পদের অণুপরমাণুতে, প্রতি মুহূর্তে সে তাকে উপহাস করে; তার সঙ্গে দিনরাত যুঝতে গিয়েই সে এমন ক্লান্ত। এ দ্বন্দ্বের হাত থেকে কি ক'রে সে রেহাই পাবে!

অমল সিগারেট ধরিয়ে আস্তে-আস্তে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলো। সুলতার মুখের দিকে চোখে পড়তেই মনে হলো বড়ো বেশি সুন্দর ঐ মুখ—অকারণ তিক্ততায় মন তার ভরে উঠলো।

সুলতার বাপের বাড়িও কলকাতায়, তবে কিনা শহরের এমাথা-ওমাথা। সকালের দিকে কি সব জিনিসপত্র নিয়ে ও-বাড়ি থেকে লোক এসেছিলো, সে ব'লে গেছে সুলতার মা'র শরীরটা নাকি তেমন ভালো নেই। কথাটা শোনা মাত্রই অমল রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠলো। সুলতাকে বললো, 'তোমার তো তা হলে একবার যাওয়া দরকার।'

'না, তেমন কিছু নয়, সামান্য একটু জ্বর মতন হয়েছে। মা তো যাবার কথা কিছুই ব'লে দেন নি।'

'বলবেন আবার কি, তাঁর খবর দেওয়ার কথা তিনি দিয়েছেন, বাকিটা তো আমাদের কর্তব্য।'

সুলতা একটু লজ্জিত হলো। বললো, 'বেশ তো, তুমিও চলো না একবার দেখে আসবে।'

অসুখটা খুবই সামান্য তবু অমল সুলতাকে ভালো ক'রে দেখাশোনা করার উপদেশ দিয়ে ব'লে এলো, দিন সাতেক পরে সে নিজেই আসবে তা'কে নিয়ে যেতে। এমন কি সময় পেলে মাঝে একদিন

এসে ঘুরে যাবে, সে কথাও বললো। জামাইএর ব্যবহারে শাশুড়িরও সন্তুষ্টির অন্ত রইলো না।

মস্ত ছুটির আনন্দ নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এলো। কয়েকটা দিনের জন্যে আত্মবন্ধ ও আত্মপীড়নের হাত থেকে সে মুক্ত। যে দাড়ি কামানোটা তার নিত্য কর্মের মধ্যে, কয়েক দিন যাবৎ সেটাও মনে হচ্ছিলো এক নীরস বাধ্যবাধকতা এবং তার জন্যেও দায়ী যেন সুলতা। আপিস কামাই ক'রে দুটো দিন গা ছেড়ে কাটিয়ে দিলো বাড়ির ভিতর। অভ্যাস অনুযায়ী রবিবার সকালে ড্রয়ারটা টানলো কলপের জন্যে দেখলো শিশিটা নেই—সুলতা বলেছিলো বটে সেটা সে ফেলে দিয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে চেয়ে নিজেই সে চমকে গেলো। একমাথা উস্কখুস্ক বিবর্ণ চুল, সমস্ত মুখটা ছেয়ে গেছে কাঁচাপাকা দাড়িতে। তা থাক—এ নিয়ে আর কয়েকটা দিন তাড়াহুড়া না করলেও চলবে।

সেদিন দুপুরের দিকে গা-হাত-পা ব্যথা ক'রে তার জর এলো। ইনফ্লুয়েনজা, দুটো দিন ভোগাবে, কাউকে খবর না দিয়ে চুপ ক'রে সে প'ড়ে রইলো।

সামান্য জর দিন দুই পরেই ছেড়ে গেলো। অমল ভাত পথ্য ক'রে দিবা নিদ্রা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে শুয়ে শুয়ে একখানা গল্পের বই পড়ছিলো, আচমকা এসে ঘরে ঢুকলো সুলতা। অমলের মুখের দিকে তাকিয়েই সে থমকে গেলো। এগিয়ে এসে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, 'বাঃ চেহারার যে ছিরি করেছ—জর হয়েছে খবর দাওনি কেন বলতো?' খুব খানিকটা বকাবকা করবে ঠিক ক'রে সুলতা ছুটে এসেছে, কিন্তু আর কোনো কথাই তার মুখ দিয়ে বেরুলো না।

অমল বিব্রত হ'য়ে অস্বস্তিসূচক একটা ভঙ্গি ক'রে বললো, 'তুমি খবর পেলে কার কাছে?'

'বিনোদ কি কাজে ওদিকে গিয়েছিলো সে বললো, ওরই সঙ্গে তো চ'লে এলেছি।'

'এ ব্যাটার সব কিছুতে আগবাড়তি মাতব্বরি—আমাকে না ক'রে—'

সুলতা বাধা দিয়ে বললো, 'ও অন্যায়টা কি করেছে—সে থাক, এখন ধীরেসুস্থে উঠে মুখটাকে কামিয়ে নাও তো—মা, বাবা, মণি, বাণী ওরা সবাই আসছে তোমার অসুখের খবর শুনে।'

'আসছে তো বয়ে গেছে, সে জন্যে আমার সাজতে হবে নাকি।' নেহাৎই খাপছাড়া ভাবে অমল ব'লে বসলো, 'হ্যাঁ—শোনো, ষাট হাজার টাকার সেই কনট্র্যাকটটা কাল সই হয়ে গেছে, প্রচুর লাভ থাকবে এটায়।'

'সে পরে শুনবো, এখন ওঠো তো লক্ষ্মীটি—চেহারায় অমন একটা অসুখের ছাপ ভালো লাগে না।' কথাটা সুলতা এবার একটু ঘুরিয়ে বললো।

'মণি, বাণী ঠাট্টা করবে ব'লে ভয় হচ্ছে নাকি'—এ ধরণের কোনো একটা হালকা কথাও অমলের মুখ দিয়ে বেরুলো না।

দাড়ি কামাতে কামাতে সে বললো 'চুলগুলো তো এই অবস্থায়ই থাকবে, শিশিটিতো ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

অমল হয়তো আশঙ্কা করছিলো কোনো একটা কৌতুক বা প্রতিবাদ, কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা গেলো সুলতা তক্ষুণি একটা চাকর ডেকে পাঠিয়ে দিলো বাজারে।

